পঞ্চম অধ্যায়

বরাকের চা জনজাতির লোকসাহিত্যে জনজীবন ও সংস্কৃতি

ব্রিটিশ উপনিবেশের হাত ধরেই মূলত বরাক উপত্যকার চা--বাগানের পত্তন হয় । উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর আগমনের ফলে এখানে চা বাগানের শুরু । চা জনজাতিদের ও একটা নিজস্ব সাহিত্য--সংস্কৃতি রয়েছে । ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধা, ঘুমপাড়ানি গান এ সবকিছুর মধ্যে দিয়েই তারা তাদের হাসি কান্না ; দুঃখ সুখ তুলে ধরে । ঔপনিবেশিক শাসকের কথা তাদের একটি প্রচলিত গানে দেখা যায় -

সাহেব বলে কাম কাম
বাবু বলে ধরে আন
সর্দার বলে লব পিঠের চাম
ও দাদা ধনীরাম, কুদাল মারা
বড় কঠিন কাম ।

যে সাহিত্য সুপ্রাচীন কাল থেকে মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে এসেছে, এখনো প্রচলিত আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে সেগুলোই লোকসাহিত্য । লোক সাহিত্যের সংখ্যা নির্দেশ করতে গিয়ে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন যে লোকসাহিত্য কেউ লিখে রচনা করতে পারে না, যখন

এর উদ্ভব হয় তখন এটা মুখে মুখেই প্রচারিত হয় । লোকসাহিত্য অত্যন্ত প্রাচীন, আদিম সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দু থেকে এর উৎপত্তি ।

--লোকসাহিত্যের শ্রেণিবিভাগ মোটামুটি ভাবে এই - লোককাহিনি বা লোককথা, লোকগীতিকা, লোকসঙ্গীত, প্রবাদ প্রবচন, ছড়া, ধাঁধা, লোকনাটক, লোকমাহাকাব্য, লোক এপিটাফ, অটোগ্রাফ বইয়ের কবিতা, মারজিনালিয়া, শিকলি চিঠি, লোক কবিতা ইত্যাদি । এর প্রত্যেকটিতেও আছে শাখা প্রশাখা । লোকসাহিত্যের সংজ্ঞা অনেকেই অনেকভাবে নিজের মতো করে দিয়েছেন । এখানে কতগুলো সংজ্ঞা তুলে ধরা যায় এভাবে, লোকসাহিত্যবিদ বরুণকুমার চক্রবর্তী লিখেছেন,

> "লোকসমাজ যে সাহিত্য সৃষ্টি করে, লোকসমাজ যে সাহিত্যের রসাস্বাদন করে তাই হল লোকসাহিত্য। লোকসাহিত্যের সাধারণ কয়টি বৈশিষ্ট্য বিত্তমান, প্রথমাবস্তায় তা লিখিত রূপে আত্মপ্রকাশ করে না, মৌখিক রচনা। একথা ঠিকই যে সাহিত্য কখনও সমষ্টিগতভাবে রচিত হয় না, প্রথমে একজনই তা রচনা করেন, তা সে লিখিত ভাবেই হোক কিংবা মৌখিক ভাবেই হোক, এরপর সংহত লোকসমাজ তা বাতিল করে অথবা গ্রহন বর্জনের মধ্যে দিয়ে একটা রূপ দেয় এই সমষ্টির স্বীকৃত রূপই হল লোকসাহিত্য ।"[১]

সপ্তশত বসু র মতামত এখানে প্রণিধানযোগ্য,-

> "সাধারণ সাহিত্যের যেমন স্রষ্টার ব্যক্তির মনন এবং প্রতিভার পরিচয় থাকে তেমনি লোকসাহিত্যের বস্তুতে সমাজের সার্বিক চেতনার প্রতিফলন ঘটে, সেখানে ব্যক্তিসত্তার প্রাধান্য বা কোন পরিচয় নেই।

সে সাহিত্যে আত্মকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনার প্রতিপালন থাকে না, সে সাহিত্য যেন সমগ্র সমাজেরই রচনা।"[২]

আশুতোষ ভট্টাচার্য মতে, -

"লোকসাহিত্য সংহত সমাজের সামগ্রিক সৃষ্টি"[৩]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লোকসাহিত্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছে,-

"গাছের শিকড়টা যেমন মাটির সাথে জড়িত এবং তাহার অগ্রভাগ আকাশের দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে তেমনি সর্বত্রই সাহিত্যের নিম্ন অংশ সদস্যের মাটির মধ্যে অনেক পরিমাণে জড়িত হইয়া ধাকা কাটে তাহা বিশেষরূপে সংকীর্ণরূপে দেশীয় ও স্থানীয় তাহা কেবল দেশের জনসাধারণেরই উপভোগ্য ও আয়ত্তগম্য সেখানে বাহিরের লোক প্রবেশের অধিকার পায় না"[৪]

লোকসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ

(ক) লোকসাহিত্যের সকল শাকা যথা ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, গীতিকা ইত্যাদি উদ্ভূত হয়েছে যে সমাজ পটভূমিকে কেন্দ্র করে তাহল সংহত লোকসমাজ।

(খ) লোকসাহিত্যের কোন একক ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি নয়, লোকসমাজের বহুজনের সম্মিলিত ভাবনা থেকে লোকসাহিত্যের উদ্ভব।

(গ) লোকসাহিত্য স্রষ্টা হিসেবে কোন এক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম দেওয়া থাকে না।

(ঘ) লোকসাহিত্য বিশেষভাবে সমাজ কেন্দ্রিক কোন বিষয়ক । প্রাকৃতিক কোন ঘটনা বা অভিজ্ঞতা ইত্যাদি ।

(ঙ) লোকসাহিত্যের বিষয় ভাবনা ও ভাষা নমনীয় ।

বরাক উপত্যকায় চা জনজাতিরও নিজস্ব লোকসাহিত্য রয়েছে । সারাদিন কঠিন পরিশ্রমের পর সন্ধ্যাবেলা তাদের সাহিত্য শিল্পের মুখর আয়োজনে আসর প্রাণোচ্ছল হয়ে ওঠে । কোথাও সঙ্গীত ধ্বনিত হয়ে ওঠে; কোথাও বা রূপকথা, ছড়া, ধাঁধার আসর বসে । কোথাও গল্প কথায়, প্রবাদে প্রবচনে বাগিচা জনতা সান্ধ্য অবসর টুকুকে উপভোগ্য করে তোলে। লোকসাহিত্য এখনও চা বাগান গুলোতে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং স্বপ্রতিষ্ঠিত। লোকসাহিত্য তাদের জীবনের একান্ত সহচর । লোকসাহিত্যের মধ্যেই তারা তাদের আত্মার শান্তি, ক্ষুধার নিবৃত্তি, মানসিক যন্ত্রণার অমৃত প্রলেপ খুঁজে পায় ।

--লোক সাহিত্য আসলে লোক সমাজ জীবনের দর্পণ। বলা যায় জাতীয় জীবনের ও দর্পণ। লোক সাহিত্য লোক লোকসমাজের আদিবাসীদের জীবন ভাষ্য । এটা সাধারণ লোকের চিন্তা ও আবেগানুভূতির জীবন্ত মনুমেন্ট । সৃষ্টিশীল সাহিত্য থেকে তা অনেকটাই আলাদা কারণ তা লিখিত সাহিত্যের মতো সময়ের গণ্ডিতে বাঁধা পড়ে যায় না। নিয়মের বন্ধন তার নেই, পরিবেশের অনুশাসন আর গণ্ডির সীমাবদ্ধতা তাকে কোণঠাসা করতে পারে না ।

লোকসাহিত্য শব্দটি দু'টি বিচ্ছিন্ন শব্দ 'লোক' এবং 'সাহিত্য' এর যোগাযোগে গড়ে উঠেছে । 'লোক' বলতে সাধারণত "অশিক্ষিত

অরণ্যপর্বতবাসী কিংবা গ্রাম্যজনতাকে বোঝানো হয়ে থাকে ।"[৫] উচ্চমানের সাহিত্যাদর্শ সম্পর্কে অজ্ঞ অশিক্ষিত সাধারণত মানুষ তাদের নিজস্ব, রুচি, ভাবনা এবং পরিবেশ মতো সমাজের সর্ব সাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য এক ধরণের সাহিত্য সৃষ্টি করে থাকে, তাই আসলে লোকসাহিত্য রূপে গড়ে ওঠে। এ সাহিত্য শিক্ষিত মানস জাত শিল্প সাহিত্য থেকে সম্পূর্ণ আলাদা । এই লোকসাহিত্যকে কেউ কেউ গ্রাম্য সাহিত্য কিংবা পল্লীসাহিত্য বলার পক্ষপাতী । আমাদের মনে হয় গ্রাম্য, পল্লী বা লোকসাহিত্য যে নামেই এই সাহিত্যকে চিহ্নিত করা হোক না কেন চরিত্রগত তারতম্য বড় একটা ঘটে না। আরণ্য গ্রাম্য বা পল্লীর সাধারণ মানুষ এই সাহিত্য সমাজের সর্বসাধারণের আনন্দ বিধানের জন্যই রচনা করে থাকে । ঠিক তেমনি আদিবাসীদের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে সাধারণত বলা হয়ে থাকে যে

> "কয়েকটি পরিবার বা গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত যে জনসমাজ একটি সাধারণ নামে পরিচিতি লাভ করে, যারা একটি বিশেষ অঞ্চলে বাস করে, একেই ভাষায় বা উপভাষায় বার্তালাপ করে, বংশ পরম্পরাগত দোল-নেতাকে মান্য করে, বিবাহে এবং ধর্মচর্চায় কতকগুলো ঐতিহ্যানুসারী রীতি রেওয়াজ পালন করে তারাই আদিবাসী ।"[৬]

আদিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণির বা গোষ্ঠীর লোকজন রয়েছে । রয়েছে তাদের নিজস্ব ভাষা এবং সংস্কৃতি এই অরণ্য-জনতার সমাজব্যবস্থা, বিবাহে এবং ধর্মচারচা আর রীতিরেওয়াজে একটু আদটু প্রভেদ ছাড়া বাকি সবক্ষেত্রেই আসলে এক ।

যে কোন সমাজের লোকসাহিত্যে সেই সমাজ তার সামগ্রিক রূপ নিয়েই প্রতিফলিত হয়ে থাকে । সেই সমাজের আচার-ব্যবহার, রীতি রেওয়াজ, উৎসব-অনুষ্ঠান, জন্ম মৃত্যু, প্রেম ভালবাসা যৌনতা, খাদ্য পানীয়, বিধিনিষেধ ইত্যাদি সব কিছুই সগৌরবে স্থান লাভ করে থাকে । শুধু সমাজ ঘটিত প্রসঙ্গগুলোই বা বলা কেন, পারিপার্শ্বিক অরণ্য-প্রকৃতি, গাছপালা, জীবজন্তু, পাখি পাখালি, গ্রাম নাম সব কিছুই লোকসাহিত্যের বিষয়বস্তু হতে পারে । বলাবাহুল্য যে লোকসাহিত্যের আঞ্চলিক চরিত্রধর্ম এগুলোর মাধ্যমেই রক্ষিত হয়ে থাকে ।

কেউ কেউ বলেন, লোকসাহিত্য কোন সম্প্রাদায় বা গোষ্ঠীর অলিখিত সাহিত্য । অর্থাৎ লোকসাহিত্য কোনদিনই কাগজে-কলমে লিখিত হয় নি; মুখে মুখেই এর প্রচার এবং প্রসার । অন্য কথায়, লোকসাহিত্য যেমন অলিখিত সাহিত্য, তেমনি মৌখিক সাহিত্য ও বটে । কিন্তু লিখিত হলেই লোকসাহিত্য তার লোক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে একথাও অনেকেই স্বীকার করেন না । কিন্তু আসল কথা হল লোকসাহিত্যের বড় ধর্মই হল সজীবতা, সচলতা । শুকনো কাগজের পাতায় যতোই মধুর করে ঝুমুরের পদাবলী লিপিবদ্ধ হোক না কেন, ঝুমুর নাচের শারীরিক আন্দোলন এবং নয়নভঙ্গি এবং রসাপ্লুত জনতার আনন্দোল্লাস পরিবেষণ করতে পারে না ।

সাঁতার শিখতে হলে যেমন জলে নামতে হয় তেমনি 'লোকসংস্কৃতি-লোকসাহিত্য' বুঝতে হলে 'লোক' বুঝতে হয় । 'লোকসংস্কৃতির' আলোচনায় 'লোক' বলতে কোনো একজন মানুষকে বোঝায় না । বোঝায় এমন একদল মানুষকে যারা সংহত একটি সমাজের বাসিন্দা । অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট একটি ভূখণ্ডে

তারা বসবাস করে তাদের আর্থিক কাঠামো একইরকম জন্ম থেকে মৃত্যু এবং বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকলে এক ধরণের বিশ্বাস--সংস্কার, আচার আচরণ, প্রথা--পদ্ধতি, উৎসব অনুষ্ঠান পালন করে থাকে ।

'সংস্কৃতি' হল সভ্যতা জনিত উৎকর্ষ । এ উৎকর্ষ জীবনচর্চার । সংস্কৃতি অনুশীলন নির্ভর, কাল পম্পরায় বহমান, ক্রমপরিবর্তনশীল । 'লোকসংস্কৃতি' হল তাই যাতে লোকসমাজের সভ্যতাজনিত উৎকর্ষের প্রতিফলন ঘটে । লোকসমাজের জীবনচর্চার উন্নত রূপটি প্রকাশ পায় ।

লোকসংস্কৃতির সংজ্ঞা অনেকেই অনেকভাবে দিয়েছেন । জোনাস বালি লিখেছেন,-

> "লোকসংস্কৃতি হল আদিম ও সভ্য মানুষের পরম্পরাগত সৃষ্টি । এই সৃষ্টিটি ছন্দের বাঁধনে আর গদ্যে ধরা পড়ে । এছাড়াও লোকসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হল লোকবিশ্বাস, কুসংস্কার, প্রথা, অনুষ্ঠান, নৃত্য ও ক্রীড়া । অধিকন্ত লোকসংস্কৃতি কেবল লোকসম্পর্কিত বিজ্ঞান নয়, এটি লোকবিজ্ঞান এবং লোকজীবন- কাব্য ।"[৭]

বি এ বটফিন লোকসংস্কৃতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লিখেছেন, -

> "সম্পূর্ণ মৌখিক সংস্কৃতির সমস্ত কিছুই লোকসংস্কৃতির অঙ্গীভূত । আধুনিক সমাজে লোকসংস্কৃতির সঙ্গে অপরাপর সংস্কৃতির তফাৎ করা হয় এই ভাবে যে, লোকসংস্কৃতিতে পরম্পরাগত শিক্ষাকে প্রথাগত শিক্ষার চেয়ে অধিক প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং সমাজের জনপ্রিয় ভাবধারাটি সংস্কারও ও ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে বেড়ে ওঠে ।"[৮]

চার্লস ফ্রান্সিস পোর্টার এর সংজ্ঞায় দেখা যায়, -

> "লোকসংস্কৃতি হল এক ধরণের সজীব জিবাস্ম যা মৃত্যুকে প্রত্যাখ্যান করে। এটি শতাব্দ ও সহস্রাব্দ প্রাচীন মানুষের অভিজ্ঞতার বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক পিছুটানের অবশেষ।"[৯]

রিচার্ড এ ওয়াটারম্যান লোকসংস্কৃতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লিখেছেন,-

> "এটি হল সেই শিল্পধারা যার মধ্যে রয়েছে নানা ধরণের গল্পকথা, প্রবাদ, যাদু,সঙ্গীত, মন্ত্র ও অন্যান্য নিয়মসূচী। এটি মৌখিক ভাষার সাহায্যে প্রকাশিত হয়।"[১০]

-- লোকসংস্কৃতিকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় এভাবে, বস্তুকেন্দ্রিক, বিশ্বাস অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক, খেলাধূলা কেন্দ্রিক, বাককেন্দ্রিক, অঙ্গভঙ্গি কেন্দ্রিক, লিখন বা অংকন কেন্দ্রিক ইত্যাদি।

বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির উদাহরণ লোকসমাজ ব্যবহৃত বস্তুসমূহ, ঘরবাড়ি, খাদ্যপানীয়, পরিধান ও প্রসাদন দ্রব্য, কৃষি ও শিকার সরঞ্জাম, আসবাবপত্র, যানবাহন, বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি।

বিশ্বাস--অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি বলতে লোকবিশ্বাস, লোক সংস্কার, লোককথা, লোক অনুষ্ঠান, লোক উৎসবকে বোঝায়। বিশ্বাস ধারণা মাত্র।

লোকসমাজে প্রচলিত বহুবিচিত্র খেলাধূলাকে আশ্রয় করে খেলাধূলাকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির উদ্ভব। খেলাধূলা দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষায় সহায়তা করে।

বাককেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির ধারাটি মৌখিক ঐতিহ্যনির্ভর । স্মৃতিবাহিত ও শ্রুতিনির্ভর লোকসংস্কৃতির যে ধারাটি মুখে মুখে প্রচলিত, সেই ধারাটিই বাককেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি । ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, গীত, গীতিকা, কথা, ইত্যাদি এই ধারার অন্তর্ভুক্ত ।

অঙ্গভঙ্গিকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতিতে অঙ্গভঙ্গি প্রাধান্য পায়। লোকনৃত্যগুলিকে অঙ্গভঙ্গি কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির নিদর্শন রূপে গণ্য করা চলে ।

লিখন বা অঙ্কনকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি বলতে বোঝায় লিখন বা অংকন সংশ্লিষ্ট লোকসংস্কৃতি । আল্পনা, দেওয়ালচিত্র, মাটির ঘট বা সরার ওপর অঙ্কিত চিত্র, পটচিত্র নক্‌শা কাঠের ওপরে খোদিত নানা ধরণের কারুকাজ এ শ্রেনির লোকসংস্কৃতির উদাহরণ।

বরাক উপত্যকার লোকসংস্কৃতির একটি সার্বিক ছক নির্মাণ করা যেতে পারে এরকম, -

লোকসংস্কৃতি

(বরাক উপত্যকার চা বাগান)

ছড়া	অভিনয়	গান	লোককথা	ধাঁধা / ভাঙানি	প্রবাদ	নৃত্য	খেলা ধূলা	পরব / পূজা	মেলা
মেয়েলি, ঘুমপাড়ানি, ছেলেভুলানো, যাদু, মন্ত্র সংক্রান্ত, কৃষি সংক্রান্ত, ব্যবহারিক, আচার সংস্কার সংক্রান্ত ইত্যাদি ।	যাত্রাপালা, মনসাপালা ইত্যাদি ।	করম, টুসু, ঝুমুর, মনসা পূজা, কাঠি নাচ, কৃষ্ণ পালা কীর্তন ইত্যাদি।	দেব দেবী, পশুপাখি, গ্রাম নাম, স্থান নাম, পাহাড় পর্বত সংক্রান্ত ইত্যাদি ।	আচার সংক্রান্ত।	সংস্কার সংক্রান্ত।	শিবের গাজন, কাঠি নাচ, ঝুমুর নাচ, টুসু নাচ, করম নাচ ইত্যাদি।	প্রচলিত খেলা, কার ধেনুক (তীর ধনুক) খেলা ইত্যাদি।	দুর্গা পূজা, ঈদ, বড়দিন, করম, ছট পূজা, মকর সংক্রান্তি, দোল উৎসব, টুসু পুজা শীতলা পুজা, মনসা পুজা, গ্রামপূজা, নৌকো পূজা, ভৈরব পূজা, বল ভোম, জিতিয়া ইত্যাদি ।	বরম বাবা, রথ, চড়ক, শিবরাত্রি, ভৈরব, বলভোম অন্যান্য ।

উল্লেখিত পুজো এবং মেলার কতগুলো ছবি এখানে দেখানো যেতে পারে, -

ছবি ১, কাছাড়ের দেওয়ান চা বাগানে টুসু বিসর্জনের একটি দৃশ্য ।

ছবি ২, কাছাড়ের দেওয়ান চা বাগানে রথযাত্রার একটি দৃশ্য ।

ছবি ৩, কাছাড়ের লেদিয়াছড়া চা বাগানে ভৈরব পূজা এবং মেলার একটি দৃশ্য ।

ছবি ৪, করিমগঞ্জের সিপেনঞ্জুরি ভীল চা বাগানে নাগ দেবতার মন্দির প্রতিষ্ঠার একটি দৃশ্য ।

ছবি ৫, করিমগঞ্জের সিপেনঞ্জুরি ভীল চা বাগানে নাগ দেবতার মন্দির প্রতিষ্ঠাতে মহিলা চা শ্রমিকের গান কীর্তন ।

ছবি ৬, কাছাড়ের দিলখুশ চা বাগানে নৌকো পুজোর মন্দিরের একটি দৃশ্য ।

বলা হয়ে থাকে চা বরাক উপত্যকার অর্থনৈতিক সোপান, অথচ বাগান ভিত্তিক সাহিত্যের প্রচার এবং প্রসার খুব হয় বলে মনে হয় নি, সাহিত্যে হয়তো সে জীবন উপেক্ষিত । কিছু লেখক / লেখিকা যারা দায়িত্ব নিয়ে নিজের কলমের মধ্যে সে উপেক্ষিত জীবনকে তুলে ধরলেন, মূলত যাদের হাত দিয়ে শুরু হল বরাক উপত্যকার চা জনজাতির লিখিত সাহিত্য তারা হলেন প্রয়াত যমুনা প্রসাদ স্বর্ণকার, অপরেশ ভৌমিক, দীপালি দত্ত চৌধুরী, বদ্রীপ্রসাদ, কাজল দেমতা, বাবুল নারাইন কানু, বিষ্ণুশংকর ভার্মা, হতে শুরু করে বিশিষ্ট অশোক ভার্মা ও ঝুমুর পাণ্ডে এরা । এখানে দু একজনের উল্লেখ করে তাঁদের দু একটি গল্পের আলোচনা করে দেখা যেতে পারে তাঁদের সাহিত্যে চা জনজাতির সমকালীন অবস্থান । এখানে

আরেকটা কথা উল্লেখ করতেই হয় যে যারা চা জনজাতিদের নিয়ে লিখেছেন বা লিখছেন তারা ব্যাক্তিগত ভাবে কোনো না কোনো সূত্রে চা বাগানের সংগে যুক্ত হয় জন্মসূত্রে নয় চাকুরিসূত্রে ।

-- অশোক বার্মার জন্ম হাইলাকান্দি জেলার লালামুখ চা বাগানে । জন্মসূত্রে চা বাগানের বলেই হয়তো তাঁর গল্পে উঠে এসেছে সেইসব জনজাতিদের প্রতি উপনিবেশিক প্রভুদের শোষণের কথা, তাঁর লেখায় উঠে এসেছে চা বাগানের ছোট বড় সব দিক যা তাঁর গল্পে চোখ বুলালেই আমরা সহজেই দেখতে পাই । ১৯৮৭ সালের ১৩ জানুয়ারি প্রান্তজ্যোতি পত্রিকায় প্রকাশিত 'পরাগ' গল্পে বক্তার বয়ানের মধ্যে ওঠে এসেছে চা বাগানের কিছু নিজস্ব পরিভাষার পরিচয়

- "কাটাখালে নদী উত্তর মুখো চলে গেছে । তারপরে একটুকরো পতিত জমি। তার পাশ দিয়ে উত্তরে দক্ষিণে ছড়ানো রাস্তা । রাস্তার পূর্বে আমাদের চা-বাগান । এ এলাকাকে পনেরো নম্বর লাইন বলা হতো । আমার বাড়ির ঠিক উল্টো দিকে পতিত জমির একাংশে আমাদের ছন বাঁশের পাঠশালা । পরেশরা থাকতো পূব লাইনে । আমাদের বাড়ি হয়ে যেতে হলে গুনতি লাইন, হাসপাতাল, গুদামঘরের বাক পেরিয়ে আর একটি বাঁক, তারপর পূব লাইন । পরেশ প্রায়ই একাকী আসতো বই শ্লেট নিয়ে । আমরা কিন্তু ঐ দিকে এখনও মাড়াইনি । ডর ডর করতো ..."[১১]

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকরা চা জনজাতিদের এখানে নিয়ে এসে তাঁদের যে ছন বাঁশ বেত ইত্যাদি দিয়ে থাকার ব্যবস্থা করে তার ১নং ২নং এরকম গলি থাকত । গলি ইংরাজিতে হচ্ছে 'লেন' এবং সেই 'লেন' ই চা

জনজাতিদের কাছে ‘লাইন’ হয়ে যায়। যা বরাক উপত্যকার চা বাগানগুলোতে আজও বর্তমান ।

- বরাক ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পত্র পত্রিকা সহ পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে ও যার লেখা ছড়িয়ে পড়েছে এবং পাঠকের মন জয় করেছে তিনি হচ্ছেন ঝুমুর পাণ্ডে। যার লেখায় মূলত চা বাগানের সব বিষয় ওঠে আসে । লেখক লিখছেন চা জনজাতিদের নিয়ে, তাঁর লেখায় আমরা পাই সেই সব মুখোশধারি ঔপনিবেশ প্রভুদের প্রতি প্রতিবাদও । তাঁর ‘আলেকজাণ্ডারপুরের কথকথা’, ‘গেরাম থানের মানুষটা ও দুলিয়া’, ‘সুখগাছের গল্প’, ‘স্বপ্ন গন্ধার খোঁজে’ প্রভৃতি লেখাতেই ওঠে আসে চা বাগানের কথা ওঠে আসে অন্য সব খেটে খাওয়া মানুষের কথা । চা বাগানের জন্ম, মৃত্যু, বাল্যবিবাহ, অশিক্ষা, অর্ধশিক্ষা, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস প্রভৃতি সব বিষয়ই লেখকের দৃষ্টি এড়ায়নি । চা বাগানের ক্ষমতার কাঠামোর বাইরের বৃহত্তর সমাজ তথা রাষ্ট্রতন্ত্রের প্রতাপান্বিত উপস্থিতিও অনুসন্ধিৎসু পাঠকের চোখে পড়ে উপন্যাস আলেকজাণ্ডার পুরের কথকথায় । উপন্যাসে রয়েছে আঞ্চলিক ইতিহাস ও আলেকজাণ্ডারপুরে লুসাইদের হানা, উইনাচেষ্টার সাহেবের খুন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ দারবি বাগানে, জাপানিদের বোমাবর্ষণ, আড়কাঠি সংযোগ চা বাগানে আগমন, বদরপুর ভৈরবী রেল লাইন স্থাপন ও স্থানীয় সমাজ বিবর্তনে তার প্রভাব । উপন্যাস এর চরিত্র লক্ষনীয় ও বুধুয়ার মেয়ের বিয়ে হয়েছে রুশকান্দি চা বাগানে । চৌদ্দ বছরের সেই মেয়ে মা হতে চলেছে । এর থেকে সহজেই অনুমান করা যায় চা বাগানগুলোতে বাল্য বিবাহ প্রথার ।

- উপন্যাসে চা বাগানের কুসংস্কার, অশিক্ষার দিক ওঠে আসে লক্ষীমনি ও বনয়ারীর বৌ এর সংলাপে

- মতি ছিল গো হামার অর্চনার পড়ায় খুব মতি ছিল। লেকিন কি করব সব ভাগ্য।

- আর লেড়কিকে পড়ায় কী হবেক ? দেখলি নাই সুলোচনাকে। মেট্রিক পাশ দিয়েছিল, বাকি হল কি ?

জন্ম উধারবন্দ এর বড়শিঙ্গা চা বাগানে। অনেকদিন থেকে সাহিত্য ও সংস্কৃতির সংগে যুক্ত এক উজ্জ্বল নাম কাজল দেমতা। কাজল দেমতার 'প্রথা' গল্পে ওঠে আসে চা বাগানে প্রচলিত ডাইনি প্রথার কথা। অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের ফলে ডাইনি সন্দেহে চা বাগানে যে কত লোক মাড়া হয়েছে তার কোনো ঠিক নেই। প্রাচীন কাল থেকে 'ডাইনি' নামক কুপ্রথা জনজাতি জীবনে যে দুর্যোগের ছায়া ফেলেছিল, সুদূর বরাক ভূমিতে এসেও শ্রমিকদের সংস্কৃতিতে তা আজও বর্তমান।

- শুধুমাত্র গল্পে নয়, ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, প্রবচনে, গানে ও ওঠে আসে সমকালীন বরাক উপত্যকার চা জনজাতির অবস্থান। শনিচরা উরাং রচিত এরকম একটি গানের কথা এখানে আমরা উল্লেখ করতে পারি

"সকাল ৭টা ৭টার সময় গো, কামলারা চলিল চাআ বাগানে,
কামলারা চলিল চা বাগানে ।।
সারাদিন খাটায় নিলি ৭২ টাকা হাজিরা দিলি ।।
চায়ে ভাতে খায়ে হামদের পেট নাহি ভরে গো ।।

কামলারা চলিল চা বাগানে ।।

কোলের বাচ্চা ঘরে, রোদ বৃষ্টি মাথায় নিয়ে,

চা গাছকে যত্ন করে তোদের পকেট ভরাই গো ।।

কামলারা চলিল চা বাগানে ।।

বড় লোকের বৌ ও বেটি কাপড় পিন্দে দামী দামী ।।

হামদের ঘরের মা বহিন ছিড়া কাপড় পিন্দে গো ।।

কামলারা চলিল চা বাগানে ।।

ধনী লোকের বাচ্চা বিদেশেতে পড়ে তারা ।।

হামদের ঘরের লেড়কা বাচ্চা বাগাল খাটে মরে গো ।।

কামলারা চলিল চা বাগানে ।।

বড়লোকের বেমার হলে নার্সিং হমে ভর্তি করে ।।

হামদের দাস্ত বখার টিবি হলেও দাওয়াই বিনা মরে গো ।।

কামলারা চলিল চা বাগানে ।।

জাত ধর্ম ভুলাই গিয়ে গরিব মানুষ এক হয়ে,

হামদের যত অধিকার লাড়াই করে লিব গো ।।

কামলারা চলিল চা বাগানে গো

কামলারা চলিল চা বাগানে ।।”[১২]

এ তো গেল বরাক উপত্যকার সৃষ্টিশীল সাহিত্যে চা জনজাতিদের বাস্তব জীবন । এবারে মূল বিষয়ে ফেরা যাক । বরাকের চা জনজাতির লোকসাহিত্যে জনজীবন ও সংস্কৃতি আমরা দেখে নেবো তাদের নিজস্ব ছড়া, প্রবাদ, ধাধা, লোককথা বা লোককাহিনী, লোকসঙ্গীত এগুলোর মধ্যে দিয়ে ।

অধ্যায়ের শুরুতেই লোকসাহিত্য এবং লোকসংস্কৃতির বলতে আমরা কি বুঝি তার আলোচনা হয়েছে এবারে সরাসরি একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যাক বরাক উপত্যকার চা জনজাতিদের লোককথা, লোকভাষা, ছড়া, প্রবাদ প্রবচন, ধাঁধা, ব্রতকথা, রূপকথা, লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য, পূজা--পার্বণ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে । সাল ১৮৫৫ তে বরাক উপত্যকায় চায়ের সন্ধান পাওয়া গেলে সাল ১৮৫৬ তে চা বাগান খোলা হয় উইলিয়াম সন এণ্ড কোম্পানির দ্বারা । বড়সাঙ্গন হল বরাক উপত্যকার প্রথম চা বাগান । কিছুদিন চা বাগান গুলোতে স্থানীয় শ্রমিক নাগা, মিজো এদের দিয়েই চালানো হয় । "The authorities were mistaken on the ground that Cachar happened to an agricultural place, where the paid labour was unknown. Moreover the inhabitants like Kacharies, Nagas, Manipuries, Kookies proved to be useful assistants in cutting jungles and clearing them, but to them the work of plantation would prove an unsuccessful one."[১৩] পরে আড়কাঠি সহযোগে বাইরে থেকে শ্রমিক আনানো শুরু হয় । "গাছ হিলালে পয়সা ঝড়ে, হুয়া কোনো দুঃখ নাইখে বা, হুয়া বহুত পয়সা বা"[১৪] আড়কাঠিরা এই প্রলোভন দেখিয়ে চা চাষের উৎপাদনের জন্য ছোটনাগপুর, বিহার, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, প্রভৃতি প্রদেশ থেকে তোড়িয়া, ভর, রিকিয়াশন, ভুঁইয়া, ছত্রি, কূর্মি, কোল, নুনিয়া, কন্দ, বাউরি, ওরাং, সাঁওতাল প্রভৃতি পদবীধারি লোকদের নিয়ে আসে বরাক উপত্যকায়। এই সব জনগোষ্ঠীরা নিজেদের জায়গা ছেড়ে কালানুক্রমে বরাক উপত্যকায় এসে বসতি স্থাপন করে । এবং একই সঙ্গে তারা তাদের সঙ্গে নিয়ে আসে তাদের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ।

লোকভাষা

সাধারণভাবে প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী লোকভাষার প্রতিশব্দ হল (আঞ্চলিক) উপভাষা ; গ্রামীণভাষাও বলা যেতে পারে । ভাষাবিজ্ঞানীরা অবশ্য লোকভাষার একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ চরিত্রই নির্দেশ করেন এবং নিছক ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতায় তাকে ধরে রাখতে চান না । গ্রামীণ বা আঞ্চলিক শব্দ এবং প্রয়োগশৈলী লোকভাষার মধ্যে মেলে ঠিকই কিন্তু সেটাই সবটুকু নয় । সামাজিক অবস্থান, পেশা, লিঙ্গ পার্থক্য, ভিন্ন সংস্কৃতি বলয়ের সঙ্গে সংযোগ ইত্যাদি অনেক কিছু পরিপ্রেক্ষিতই লোকভাষা গড়ে তুলতে সাহায্য করে । এমনকি গালাগালি প্রয়োগের বিভিন্ন মাত্রিক শৈলী ও লোকভাষার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ । অপরাধ জগত বা আণ্ডার ওয়ার্ল্ড এর ভাষা ও কিছু কিছু একে উপাদান যোগায় । শহরের ককনি বা স্ল্যাং সিনেমা টিভি মারফতে আসা শব্দ ইত্যাদি ও এর পরিশোষণ করে । সুতরাং লোকভাষার স্বরূপ কী তা নির্ধারণ করতে হলে আর্থ--সামাজিক ও রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন দিক এবং মূল বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করতে হবে সর্বাগ্রে । বরাকের চা জনজাতিদের ও যে নিজস্ব একটা ভাষা রয়েছে । রয়েছে তাদের লোকসাহিত্যও।

একটি ওড়িয়া ছড়া এখানে আমরা উল্লেখ করতে পারি

" নান্ডি মুণ্ডি পাই টেঙ্গরি
শিমলো গছে বসা
ধাঁইআরে পাইকো বুড়ো
নান্ডিকে নেলা মুশা ।"

বাংলায় অনুবাদ করলে যার অর্থ দাঁড়ায়, নান্ডি মুন্ডি মানে হল নাতি নাতনি। শিমলো গছে মানে শিমূল গাছে। ধাঁইআরে মানে তাড়াতাড়ি এসো। পাইকো বুড়ো মানে ফোকলা দাঁতের বুড়ো লোক। মুশা মানে ইঁদুর। সুতরাং আপাত দৃষ্টি দিয়ে এর ভাব প্রকাশ এভাবে করা যেতে পারে যে কয়েকটা বাচ্চা শিমূল গাছের তলায় বসে সম্পর্কে দাদু হয় এরকম একজন ফোকলা দাঁতের বুড়োকে মজা করে বলছে তাড়াতাড়ি দৌড়ে যেতে আর তাঁর মাথার চুল কি ইঁদুর নিয়ে গেছে। সম্ভবত মুশিক থেকেই মুশা এসেছে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে বাংলা ভাষায় যেরকম ঠাকুমার ঝুলি থাকে ঠিক তেমনি ঠাকুমা দাদু, নাতি নাতনির সম্পর্ক নিয়ে ওড়িয়া ভাষায় ও কৌতূহল উদ্দীপক মজার মজার ছড়া রয়েছে। এরকম ভুরিভুরি উদাহরণ আছে চা সংস্কৃতির ভাণ্ডারে। যা সহজেই আমাদের মন কেড়ে নেয়।

আমরা জানি লোকভাষা তার আঞ্চলিক রূপ নিয়েই সহজ এবং সুন্দর তবে ওটা কোনো বিশেষ অঞ্চলের উপভাষা নয়। ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, প্রবচনে অচেনা শব্দ প্রয়োগ এবং যে কোনো শব্দের উপরই অযথা ভয় বিশ্বাস বলা যেতে পারে লোকভাষার বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য লোকভাষার মতো বাগান অঞ্চলের লোকভাষার মধ্যেও একটা মিশ্র প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ভাষা বিজ্ঞানীরা চা জনজাতিদের ভাষাকে একটা মিশ্র ভাষা বলেছেন, বাগানিয়া (হিন্দি, বাংলা) 'ছিলমিল' ইত্যাদি নামকরণ করেছেন চা জনজাতিদের ভাষার। যদিও ইদানীং কালে অনেক তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখা যায় যে গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন, চা বাগানকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বসতি অঞ্চল, একই উৎপাদন প্রক্রিয়া ও জীবন সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে

এই জনগোষ্ঠীর লোকেরা নিজেদের মধ্যে ভাবের আদান- প্রদান করার জন্য একধরণের কথ্যভাষা গড়ে তুলেছেন। যাকে বলা হয় সাদরি কিংবা বর্ধমানী।

লোককথা বা লোককাহিনি

রূপকথা, উপকথা, লোককথা বা শুধুই কথা লোকসাহিত্যের একটি অন্যতম জনপ্রিয় সম্পদ । লোকসাহিত্য আলোচনার সর্বশেষ উপাদান হল ব্রতকথা, ইতিকথা এবং পুরকথার সঙ্গে জড়িত কাহিনীগুলো । করম, জিতিয়া আদি ব্রতকথার কাহিনীর পাশাপাশি জীবজন্তু ইত্যাদির জন্মকাহিনীও আলোচনা করা যেতে পারে । গল্প বলার রীতিটা আসলে মানুষের মধ্যেই থাকে । প্রত্যেকটা চরিত্রই আসলে গল্পের একএকটা চরিত্র । মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনের হাসি কান্না, দ্বন্দ্ব--সংঘাত সংগ্রাম প্রভৃতি দিয়েই গল্প বলে। সৃষ্টিশীল গল্প থেকে লোকগল্প/লোককথা এর জন্যেই আলাদা কারণ তা লোক মুখে মুখে প্রচলিত থাকে । যার মধ্যে কোনো ব্যাক্তি মালিকানা থাকে না । লোকগল্পের মধ্যে অবাস্তব সব জিনিষ গুলো কল্পনা করা যায় । যাদু ভ্যালকি প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপে লোকগল্প ভরপুর থাকে । বাংলার লোককথায় কয়েকটি ভাগ থাকে যেমন পশুকথা, রূপকথা, পরীকথা, কিংবদন্তীর গল্প, ব্রতকথা, লোকপুরাণের গল্প, গীতিকার গল্প ইত্যাদি । বরাক উপত্যকার চা বাগান অঞ্চলের জনজাতিদের মধ্যে ও অনেক রকমের লোককথা / লোকগল্পের প্রচলন লক্ষ্য করা যায় ।

ক্ষেত্র সমীক্ষণ করতে গিয়ে কাছাড় জেলার দেওয়ান চা বাগানের মহিলা শ্রমিক সুখমন্তি দাস, বয়স ৬০ একটি লোককথা শোনালেন ।

‘গোপালজির গল্প’ বলেই সেটা বাগান অঞ্চলে প্রসিদ্ধ । গল্পটা বাংলার গোপাল ভাঁড়ের বিখ্যাত এক গল্পের আদলে গড়া । গল্পটা এরকম,

গোপাল বলে একজন চা শ্রমিক চা বাগানের সাহেবের বাংলোয় কাজ করতো । যথারীতি বাংলোয় যেরকম পার্টি সার্টি হয় সেরকম সেই সাহেবের বাংলোতেও হতো । গোপাল দিন রাত কাজ করত ঐ বাংলোয় কিন্তু তাকে কোনোদিন কোনো ভালো খাবার বা ভালো ব্যবস্থা, ভালো কাপড় চোপড়ের ব্যবস্থা সাহেব তাকে দেয় নি । এরকম করেই কাটত তার দিন, তারা খেয়ে দেয়ে যা অবশিষ্ট থাকে তাই জুটত গোপালের কপালে । রাতে তাকে শুতে হত বাইরে বছরের সব ঋতুতেই । স্বাভাবিক ভাবেই শীতে গোপালকে এমনি শুতে হতো, এসব সহ্য করে করে গোপাল একদিন সাহেবকে শীতবস্ত্র, ব্ল্যাংকেট দিতে অনুরোধ করল যে সাহেব শীতে কষ্ট হয় বলে । সাহেব তার অনুরোধ নাকচ করে দিল এবং বলল তাকে ওরকমই থাকতে হবে । আলাদা শীতের কাপড়ের, ব্ল্যাংকেট এর কি দরকার বাংলোয় তো রুম হিটার আছেই তাতেই তো পুরো বাংলো গরম হয় উঠেছে, তার রাগ হয় সাহেবের কথা শুনে । সে দেখে ঘরে আগুন জ্বললেও তো তারা তো ঠিকই শীতের কাপড় ব্যবহার করে । গোপাল বসে বসে বুদ্ধি বের করল কি করা যায় একদিন সে কি করল সাহেবের খাবার করতে গিয়ে হাড়ি দিয়েছে অনেক উঁচুতে লাগিয়ে আর নিচে দিচ্ছে আগুন, এদিকে সময়ের পর সময় যাচ্ছে টেবিলে তো আর খাবার আসে না, সাহেব গোপালকে খাবার কোথায় বললেই গোপাল বলে এইতো সাহেব হচ্ছে । অগত্যা বাধ্য হয়ে সাহেব গিয়ে দেখে গোপাল এরকম রান্না করেছে । রেগে সাহেব জিজ্ঞেস করছে এটা তুই কি করছিস এরকম খাবার হবে, আগুন হাড়ি থেকে কত নিচে গরম হবে কি করে । তখন গোপাল

বলল যে হবে সাহেব। কারণ সাহেবেই তো তাকে বলেছেন আগুনের গরম অনেক দূর পর্যন্ত যায়। এবার সাহেবের মাথায় এলো যে গোপালকে শীতের কাপড়, ব্ল্যাংকেট দেওয়া উচিত। আর সংগে সংগে লোক ডেকে পাঠিয়ে সাহেব গোপালের ব্ল্যাংকেটের ব্যবস্থা করে দিল।

সেই থেকেই নাকি চা বাগান গুলোতে ব্ল্যাংকেট দেওয়া হয়েছে এটা বাগান শ্রমিকদের ধারণা। তাদের মতে গোপালজির এই বুদ্ধির জন্য তারা ওগুলো পেয়েছে। গল্পে সহজেই দেখা যায় চা শ্রমিকদের উপর অত্যাচার, শোষণ এবং বঞ্চনার কথা। এরকম আরও অনেক মজার মজার লোককথা প্রচলিত রয়েছে।

ছড়া

- অনেকের মতে ছড়া শুধু লোকসাহিত্যেরই শাখা নয়, ছড়া সাহিত্যমাত্রেরই শাখা। কারণ ছড়া হল শিশু এবং নারীর একান্ত সম্পদ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই প্রথম ছড়াকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে বাংলা ছড়ার বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন এভাবে,

(১) "ছড়াগুলিও শিশুসাহিত্য, তাহারা মানবমনে আপনি জন্মিয়াছে।"

(২) "কেহ কেহ বলেন একখানা আস্ত গ্রহ ভাঙিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে। এই ছড়াগুলিকেও সেইরূপ টুকরো জগৎ বলিয়া আমার মনে হয়।"

(৩) "প্রত্যেক ছড়ায় প্রত্যেক তুচ্ছ করে বাংলাদেশের একটি মূর্তি, গ্রামের একটি সঙ্গীত, গ্রহের একটি আস্বাদ পাওয়া যায় ।"

(৪) "আমি ছড়াকে মেঘের সহিত তুলনা করিয়াছি। উভয়েই পরিবর্তনশীল, বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত, বায়ুস্রোতে যদৃচ্ছ ভাসমান ।"

(৫) "বাস্তবিকতার কোঠা পার হইয়া মানসিকতার মধ্যে উত্তীর্ণ হইতে হয়। প্রাত্যহিক ঘটনা, সাংসারিক ব্যপার, সামাজিক রহস্য সেখানে স্থান পায়না।"

-- শিশুরা যা কিছু দেখে সব কল্পনার রঙে রঞ্জিত যা কিছু ভাবে সব কল্পনার ভাষায় রচিত । তাদের চিন্তা জগতে সঙ্গত অসঙ্গত স্বাভাবিক অস্বাভাবিক প্রকৃত-অপ্রকৃত বলে কোন জিনিস থাকে না। প্রকৃতির রাজ্যে অসংলগ্নতা, অস্বাভাবিকতাই যেন তার মনকে বিশেষভাবে আন্দোলিত করে থাকে । ছড়ার মধ্যে শিশুর ভাবজগতের এই সব কল্পনাই উজ্জ্বল রঙে রঞ্জিত হয়ে প্রকাশ পায় ।

ছড়ার মূলধনই হল সংহতি এবং সঙ্গতির বেড়া ভেঙে চকিত চরণে প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে, অর্থ থেকে নিরর্থে পরিক্রমণ । আশ্চর্য চমক, অলৌকিকতা, অর্থহীনতা, শব্দের ব্যঞ্জনা এবং সংগীতময়তা, ছন্দের দোলা এবং ধ্বনির গভীর হৃদয় ছোঁয়া সুর ছড়াকে অন্যান্য ছন্দোবদ্ধ সাহিত্যকর্ম থেকে একটি সম্পূর্ণ পৃথক সত্তা দিতে পারে ।

ছড়া চমক, শব্দের ব্যঞ্জনা এবং সঙ্গীতময়তা, ছন্দের এবং ধ্বনির অলৌকিক মেল বন্ধনে গড়ে ওঠে । ছড়াই এইসব সাধারণ ধর্মের সঙ্গে

কখনো কখনো অর্থহীনতা এমন নিবিড় ভাব জমায় যে তখন তার অস্তিত্ব আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় । শব্দ, ছন্দ এবং ধ্বনি যৌথবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একটি সঙ্গীতময় পরিবেশ রচনা করে যেখানে উদ্ভট কথার সঙ্গে অর্থহীনতা একই পরিবারের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মতো পাশাপাশি বাস করবার সুযোগ পায়। চিত্রধর্মিতা ছড়ার একটি সাধারণ ধর্ম । চিত্রের যেমন ভাষা আছে, তেমনি অর্থও আছে ।

- ছড়া একান্তভাবে সুর, তাল এবং ছন্দ প্রধান । পৃথিবীর সব দেশে সব মানবসমাজেই ছড়ার একটি বিশেষ সুর থাকে । ছড়ার প্রধানতম উপজীব্য হল শিশু। শিশুই ছড়ার সর্বাধিক অংশ অধিকার করে আছে । বরাক উপত্যকার চা জনজাতিদেরও রয়েছে নিজস্ব ছড়া । নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ছড়াকে ভাগ করা যায়, ঘুমপাড়ানি ছড়া, ছেলে ভুলানো ছড়া, খেলা ধূলার ছড়া, সাধারণ জীবন সম্পর্কিত ছড়া, কাহিনী বিষয়ক ছড়া, ঐন্দ্রজালিক ছড়া ।

-- বরাকের চা জনজাতিরা ঘুমপাড়ানি ছড়াকে গানও বলে থাকে তাই এটা বিশেষ সুর ও তাল নির্ভর হয় । সুর বাদ দিয়ে ছড়ার অস্তিত্বের কোঠা ভাবাই যায় না । ঘুমপাড়ানি ছড়ার বিষয়বস্তুও শিশু নিজে । প্রাণচঞ্চল শিশুকে ঘুম পাড়ানোর জন্য সুরে সুরে ছড়া আউড়ে তালে তালে তাকে চাপড়াতে হয় । ছড়ার কথায় ছন্দের দোলা যেমন থাকে, তেমনি থাকে অনুপ্রাস; এর সঙ্গে যুক্ত হয় সুর এবং তাল । স্বভাবতই সুর করে আওড়ানোতে শিশু আনন্দ পায় এবং ঘুমিয়ে পড়ে । বরাকের চা জনজাতির ঘুমপাড়ানি গানে মাসি পিসির, কখনও নিদ্রাপাখির র দর্শন পাওয়া যায় । কয়েকটি ঘুমপাড়ানি ছড়া/ ঘুমপাড়ানি গান এখানে উল্লেখ করা যায়,

(১) ঘুমা নুনু ঘুমা

মাছ ধরতে যাব

মাছের কাটা পায়ে ঢুকলে

ডলায় চেপে যাব

আয়রে ছেলে পুলারা

মাছ ধরতে যাব ।

(২) যার ঘরে ছেলে নাই

মন করে ডুহুক ডাহুক

ছেলা মূতে করে কাদা গো

মন ডুহুক ডাহুক ।

(৩) ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি

মোদের বাড়ি যাইও

শান্তি সুখের নিন্দরা

নীলমণিকে দিও ।

(৪) আয়রে ঘুম- করা

তোকে দেব ডিম পড়া ।

(৫) ছানা ঘুমা ঘুমা রে

তোর বাপ ঘুমাইলো ।

ছানা ঘুমায় নাই

ছানার প্রাণ হারাইলো ।

(৬) আয়রে বনচড়া'য়া

বনে বনে যাই ।

খোকার মা পান খায়েছে

শাউড়ি বাঁধা দিয়া ।

(৭) আয়রে টিয়া

লাফঝাঁপ দিয়া

খোকা আমাদের পান খায়েছে

শাউড়ি বাঁধা দিয়া ।

(৮) আয়রে পাখি বসরে ডালে

ভাত দিবরে সোনার থালে

খাবি দাবি গান করবি

আমাদের খোকাকে ঘুম করাবি ।

(৯) আয়রে ভালুক

আঁদাড়ে পিঁদাড়ে থাক

খোকার মা জলকে গেলে

খোকার কান খা ।

(১০) আয় ঘুমানি আয়

ভালুকে তেঁতুল কুটাই খায় ।

ভালুকে নুন কুথায় পায়,

ভালুকে তেল কুথায় পায় ।।

ছেলে ভোলানো ছড়ারও উপজীব্য শিশু নিজে । ছেলে ভোলানো ছড়া হচ্ছে জগ্রত শিশুর মনোরঞ্জন । এর সুর যেমন দ্রুত হয় তেমনি ছন্দ তালও ।

(১১) খোকা খোকা ডাক পাড়ি

খোকা যায়রে কার বাড়ি ।

শিকায় ডাল বাটায় পান

হামদের খোকাকে ডাকি আন ।

হামদের খোকা খায় না ভাত

কোথায় পাব মাগুর মাছ

কাল যাব লাবক হাট

কিনে আনব মাগুর মাছ ।

(১২) খুকু সিনাছে গা দুলাছে

হাতে তেলের বাটি

নুয়ে নুয়ে চুল ঝাড়ছে

হিলছে সোনার কাঠি ।

(১৩) চুপ কর ন চুপ কর ন

বিলাই আসছে,

বাবুর মতন লড়কা গিলান

গোটাই গিলছে ।

(১৪) খোকা গেছেরে কোনখানে

বাসফুলের বন যেখানে ।

সেখানে খোকা কি করে,

ডাল ভাঙে আর ফুল পাড়ে ।

(১৫) খোকা ও খোকা

যাইও না রে বন,

ঘরে বসি বানাই দিব

রতন সিংহাসন ।

(১৬) খোকা গেছে হলুদ বাড়ির বন

খোকাকে যে দেখতে নারে

পুড়ুক তাহার মন ।

যার ঘরে খোকা নাই

কিসের গরব করে,

তারা পুড়ে কেনে নাই মরে ।

খোকা গেছে হলুদ ফুলের বন

খোকাকে যে গাল দিয়েছে

পুড়ুক তাহার মন ।

খেলাধূলার ছড়াগুলো শিশুদের মুখেই ধ্বনিত হয়ে থাকে। তারাই বিশেষ বিশেষ খেলার প্রয়োজনে এই সব ছড়া রচনা করে থাকে।

(১৭) অকল বকল টকল টিয়া
ধমসা নাগরা বাজে হিয়া।
ইস বিষ করম ঠিস
ঠারে ঠুরে উনিশ বিশ।

(১৮) অড় গাছ বড় গাছ
তার তলে জগন্নাথ।
জগন্নাথের হাঁড়িকুঁড়ি
সুরু চাল কাঢ়ি।
কাঢ়তে কাঢ়তে হল ভাত,
উঠ বুড়া জগন্নাথ।

(১৯) ইকিড় মিকিড় দাঁত কিড়কিড়
লহালতি বেলপাতা,
বাড়ি এ আছে নিম গাছটি
নিম ঝরঝর করে
সওদাগরের বেটাবিটি
নিত লিয়াই লাগে
খাঁকড়া ন কুঁচ্যা।

(২০) একটা কথা শুন ।

কি কথা ?

বেঙলতা ।

কি বেঙ ?

টুরি বেঙ ।

কি টুরি ।

বামহুন বুঢ়ি ।

কি বামহুন ?

চণ্ডী বামহুন ।

কি চণ্ডী ?

পিঠা খণ্ডি ।

কি পিঠা ?

তাল পিঠা ।

কি তাল ?

খেজুর তাল ।

কি খেজুর ?

পেঁক মেজুর ।

কি পেঁক ।

সনা পেঁক ।

কি সনা ?

আমি হাগি তুই গু খা না ।

- বাস্তব সংসারের সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনার কাহিনী সাধারণত সাধারণ জীবন বিষয়ক ছড়ার বিষয়বস্তু হয়ে থাকে। বয়স্ক নারী রচিত হলেও এই ছড়াগুলি মূলত ছেলে মেয়েরা অবসর সময়ে নিজেদের চিত্তোবিনোদনের জন্য আবৃত্তি করে থাকে।

(২১) ধান কুটি ধান কুটি
উসনা কুড়া দিয়ে
ওই আইলো ময়না বুড়া
দুটি পিঠা নিয়ে।
একটি দুটি পিঠা গিরলো
পাড়ার লোকে কূড়ালো
গাঁই করে হাম্বা
বাছুর করে চি
একেবারে ধান শুকাবো
খরিস সাপের বিষ।

(২২) কে রে ছলা বাড়ি- এ গাঁদার গুঁদুর করে।
হিঙের বাসে জামাই গেল রুস্যে।
জামাইকে নিঁয়ে আন জড় ধুতি দিঁয়ে।
বিটিকে নিঁয়ে দুয়াঁই শাঁসা দিয়ে।
আজ থাক রে বর কন্যারা পেঁক খেজুর খায়ে।
কাল যাবে রে বরকন্যার সংসার কাঁদায়ে।
আগে কাঁদে মাসিপিসি তারপর কাঁদে পর
পরদেবতা লিখে দিলে যাবি পরের ঘরে।

কাহিনী বিষয়ক ছড়াতে ভেতরেই কাহিনীর বীজ লুকোনো থাকে ।

(২৩) দশ পন্থ রাবণ
ভায়া কোন পন্থে গেল ?
শিলাগড় পরবতে চড়ে
চালতা রসে মিশে গেল ।

ঐন্দ্রজালিক ছড়াতে সাধারণত জাদু, ভ্যালকি, ঝাড়ফুঁক, ইত্যাদি লুকিয়ে থাকে ।

(২৪) এক পইলা মুড়ি
যায় বর্ষা উড়ি
জল যায় উড়ি ।

(২৫) কলাপাতের বিঁড়ি
যায় বর্ষা ছিঁড়ি ।

(২৬) রোদ দিছে জল হছে
বাড়া শিয়ালের বেহা হছে ।

(২৭) একটি ধানে দুটি তুঁষ
কিরা ভাঙে ঠাসঠুস ।
ঘটির উপর বাটি
সাত কিরাকে কাটি ।।

ভূত তাড়ানোর মন্ত্র,

(২৮) "শিরি শিরি শিবশংকর গুরু
মহাতপস্বী একুইশো চণ্ডী
ষড়ো পাট নওলাখ
বীর ধীর সন্ন্যাসী যাত্রাধারী
তেত্রিশ কোইট যোগশ্রী
বহে গঙ্গাধারা
কণ্ঠে গরজ হৃদে রুদ্রাক্ষমালা
রূপ উজাগরে অঙ্গে বিভূতি ...
নেহিতো ত্রিশূল বাণে করুঁ ঘায়েল
ভূত ভাগে দূত ভাগে
দোহাই বিশ্বনাথজীকে
কোইট কোইট নমস্কার ।"[১৫]

ধাঁধা

ধাঁধা লোকসাহিত্যের অন্যতম বিশিষ্ট উপকরণ হলেও লোকগীতি এবং কথার সঙ্গে মৌল পার্থক্য এই যে, ধাঁধার মধ্যে মননশীলতা অনুস্যূত হয়ে থাকে, কিন্তু লোকগীতি এবং কথার মধ্যে হৃদয়ানুভূতি নিহিত থাকে । একসময় আদিমকালে ধাঁধা জনশিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হত । ধাঁধা কবে কোনযুগে প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল তা বলা কঠিন । রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে ছড়াই লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম সৃষ্টি । আবার জনৈক পাশ্চাত্য পণ্ডিত

ধাঁধাকেই প্রাচীনতম সৃষ্টি বলে উল্লেখ করেছেন । তিনি মনে করেন যে ধাঁধা যেহেতু রুপক বিশেষ এবং আদিম মন দুটি বস্তুর সংসর্গ, তুলনা, ঐক্য এবং বৈপরীত্য লক্ষ্য করেই চিন্তাধারাকে একটি বাস্তব রূপ দিত, তাই ধাঁধাই লোকসাহিত্যে প্রথম সৃষ্টি । এদিকে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন,

> "মননশীলতায় অগ্রসর কোন সমাজের সংস্পর্শে না আসিলে কিংবা তাহা দ্বারা কোন না কোনভাবে প্রভাবিত না হইলে সেই সমাজে ধাঁধার জন্ম হইতে পারে না ।"[১৬]

প্রসঙ্গক্রমে তিনি আরও বলেছেন যে আদিবাসী সমাজে ধাঁধার প্রচলন অনেক আগে থেকেই ছিল । তুকতাক অলৌকিকতার যুগে মানুষ অনেক কিছুই সরাসরি বলতে ভরসা পেত না, তাই সে রূপকের আকারে কিংবা বক্তব্য বিষয়ের সঙ্গে একধরণের সামঞ্জস্য রেখে কথাটা ঘুরিয়ে বলত ।

সামাজিক এবং ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে এখনো ধাঁধার প্রচলন দেখা যায় । ধাঁধার মধ্যে যেহেতু মননশীলতার প্রয়োজন, তাই একযোগে বহুজনের মননশীলতা নিশ্চয়ই একটি ধাঁধার সৃষ্টিকার্যে সম্মিলিত হয় নি । অর্থাৎ ধাঁধা যে ব্যক্তি সৃষ্টি এই কথাটি আমাদের স্বীকার করে নিতেই হয় । যুগে যুগে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ধাঁধার ব্যবহার করা হয়েছে । পাশ্চাত্য দেশে ধাঁধা বা (রিডল) এর উপদেশমূলক শিক্ষাবিধি ছিল। ধাঁধার মধ্য দিয়ে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায় বা জাতির মানসলোকের সন্ধান সহজেই পাওয়া যায় । তাদের চিত্তবৃত্তি বা মননশীলতা কোন পর্যায়ের তা তাদের ধাঁধার গঠনভঙ্গি, বিষয়বস্তু ইত্যাদি থেকে অনায়াসে অনুমান করা যায় । বাস্তব বস্তু

বা ভাবকে সরস ভাষায় এবং চিত্রে রূপায়িত করে লোকজীবনে আনন্দ সঞ্চার করে ধাঁধা। ধাঁধার কতগুলো বৈশিষ্ট্য হল,

(ক) ধাঁধা সম্পূর্ণ যৌথভাবে উপভোগ্য । এরজন্য কমপক্ষে একজন জিজ্ঞাসাকারী এবং একজন উত্তরদাতার প্রয়োজন । অবশ্য আড্ডায় বা মজলিসেই এর আসর বিশেষভাবে জমে ওঠে ।

(খ) -ধাঁধা প্রধানত মস্তিষ্কজাত হলেও এর মধ্যে কাব্যগুণ একেবারে অনুপস্থিত থাকে না । জীবনরসসমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা থেকে এর উদ্ভব বলেই এগুলো অত্যন্ত সরস হয়ে থাকে। ভাবে ভাষায় গঠনভঙ্গিতে রূপকে উপমায় এগুলো কাব্যধর্মী হয়ে ওঠে ।

(গ) -ছন্দের বাঁধুনি প্রায় ক্ষেত্রেই নিখুঁত এবং আঁটোসাঁটো; ফলে যুগ যুগান্তর লোকমুখে প্রচারিত হলেও পরিবর্তনের স্রোতে একেবারে হারিয়ে যায় না কিংবা সম্পূর্ণ অন্যরূপ ধারণ করে না ।

(ঘ) আদিম মানুষের সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার ফসল এই ধাঁধার ভাণ্ডারেই সঞ্চিত হয়ে থাকে; ফলে এদের মধ্যে লোকমানসের গভীর চিন্তাশীলতা বা চিন্তার গভীরতা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। বহু যুগের চিন্তাভাবনা, ধ্যানধারণা, বস্তুজ্ঞান,রসবোধের জাদুস্পর্শে সুসংহত ছন্দোবদ্ধতায় শাশ্বত কালের ধাঁধার শরীর লাভ করে থাকে ।

(ঙ) ধাঁধার গঠনভঙ্গিতে পরিচ্ছন্নতা এবং সুসংবদ্ধতাও বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে থাকে।

(চ) পরিচ্ছন্ন, সুসংবদ্ধ স্বল্পায়তনের মধ্যে কাব্যগুণ ও চিত্রময়তার নিগূঢ় সাহচর্যে ধাঁধা শ্রোতার সম্মুখে ইঙ্গিতময়তার একটি শরীরী রূপ নিয়ে উপস্থিত হয় এবং এই কারণেই জনচিত্তে মনোহারী অনুভবের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।

(ছ) ধাঁধার বিষয়বস্তু সব সময়ই বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে; নিছক কল্পনাজাত বিষয় এর অঙ্গীভূত হয় না।

- গঠনরীতির দিক দিয়ে ধাঁধার আরও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। একটি বক্তব্য যখন একটি পঙতিতেই শেষ হয়ে যায় তখন তার পাদপূরণের জন্য কিংবা ছন্দমিল বজায় রাখার জন্য কিংবা নিছক অলঙ্কার হিসাবে ব্যবহারের জন্য একটি অতিরিক্ত পদের সংযোজন করা হয়ে থাকে, তাতে অবশ্য এর চরিত্রের কোন হেরফের ঘটে না। এদিক থেকে দেখলে ধাঁধার সঙ্গে ছড়ার এবং কিছু কিছু লোকগীতির একটা ঘনিষ্ঠ মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ধাঁধাকে মোটামুটি প্রকৃতি বিষয়ক, গার্হস্থ্যজীবন বিষয়ক, তত্ত্ব ও আচারমূলক এবং গাণিতিক ধাঁধা এই চার ভাগে ভাগ করা যায়। বরাক উপত্যকার চা জনজাতিরা ধাঁধাকে 'ভাঙ্গানি' বলে। নীচে কতগুলো ধাঁধার উল্লেখ করা যায়, এভাবে

(১) ঝাপঝুপরা গাছটি
তার তলে সাপটি।
- উত্তরঃ বেগুণ।

(২) বড় বড় বিলে ফত্রি মিলে

হাত নাই পাও নাই

মানুষ গিলে ।

- উত্তরঃ জোঁক ।

(৩) জঙ্গল্‌লে বার হইল বুড়া

বুড়া বলে আমি মহাজন বুড়া ।

- উত্তরঃ দাঁড়িপাল্লা ।

(৪) এক যে আছে মস্ত বড় বীর,

উয়াকে চইখে দেখতে পাই না ।

- উত্তরঃ হাওয়া ।

(৫) আকাশ গুড়গুড় পাথরঘাটা,

সাত শ ডালে দুটাই পাতা ।

- উত্তরঃ শিলাবৃষ্টি ।

(৬) উপর লে পড়ল ধুম,

ধুম বলে আমার পোঁদটা শুং ।

- উত্তরঃ তাল ।

(৭) মইধ বনে ঘটি টাঁগা ।

- উত্তরঃ বেল ।

(৮) মাছ বনে ফাল টাঁগা ।

- উত্তরঃ বাকড় ।

(৯) কাকা হে কাকা,

বীচ বাহির ফল পাকা ।

- উত্তরঃ ভেলা ।

(১০) এতটুকু ডালে,

কিস্ট ঠাকুর দলে ।

- উত্তরঃ তেঁতুল ।

(১১) মা ঝাঁপড়ী,

বিটি সুঁদরী ।

- উত্তরঃ লঙ্কা ।

(১২) শাঁক নদীর পাঁক নাই,

জল আছে ত মাছ নাই ।

- উত্তরঃ ডাব ।

(১৩) কেউ হাঁসে কেউ ভাঁসে

কেউ কাদায় লটপট ।

- উত্তরঃ পাতা ও মূল ।

(১৪) গাইটা রইল বাঁধা, চরতে গেল পাঘা ।

-- উত্তরঃ লাউ কুমড়োর পাতা ও ফল ।

(১৫) ঝাপঝুপরা গাছটি

তার তলে শাকটি ।

- উত্তরঃ মুলো ।

(১৬) এ হেন মটা ঝাপঝুপরা কাপড়ের তলে থাকে,

ছানায় দেখলে মাগে, ঠাকুর পূজায় লাগে ।

- উত্তরঃ ভুট্টা ।

(১৭) চিকচিক পাতা লিকলিক ডাঁডি,

খাতে মধু ফেলাতে চপা ।

- উত্তরঃ আখ ।

(১৮) উপর লে পড়ল ছুরি,

ছুরি বলে আমি ঘুরি ঘুরি পড়ি ।

- উত্তরঃ বাঁশ পাতা ।

(১৯) উত্তর দক্ষিণ পুরুষ পচ্ছিম ছাঁচা,

কোন ফলটা কাঁচা ।

- উত্তরঃ জিভ ।

(২০) একটুকু কানি,

শুকাতে না জানি ।

- উত্তরঃ জিভ ।

(২১) কাটলে বাঁচে, না কাটলে মরে ।

- উত্তরঃ নবজাতকের নাভিচ্ছেদন ।

(২২) নওয়াতে পারি, ভাঙতে নারী ।

- উত্তরঃ চুল ।

(২৩) গাছটা গেল চলি,

পাতটা রইল বসি ।

- উত্তরঃ পায়ের ছাপ ।

(২৪) দশে মাসে আইল কুটুম খাসি খাবে বলে,

খাসির ত হাড় নাই, কুটুমের ত দাঁত নাই ।

- উত্তরঃ নবজাত শিশু ।

(২৫) একটা গিরায় ঘরটা ডাঁড়ায় ।

- উত্তরঃ বোলতার চাক ।

(২৬) আট পা ষোল হাঁটু, মাছ ধরতে যায় লাঠু

শুকনা বাঁধে ফেলি জাল, মাছ ধরি খায় চিরকাল ।

- উত্তরঃ মাকড়সা ।

(২৭) কুত্থির মতন জিনিসটা,

ঢেঁকির মতন আহার করে ।

- উত্তরঃ ছারপোকা ।

(২৮) দুই সতীনের একেই রা,

কার বা ডিম কার বা ছা ।

- উত্তরঃ চিল ও ঘোড়া ।

(২৯) আঁকা বাঁকা নদীটি দিক চরণে যায়,

সাত রাজার কপাট খুলি কাঠকলাই খায় ।

- উত্তরঃ ঘুণ ।

(৩০) গাছে ঠেং জ্বলে পঁদ ।

- উত্তরঃ জোনাকি ।

(৩১) গাই ত গপী লয় দুদ্ ত মিঠা

ষোল শ সতীনের একটা পিঠা ।

- উত্তরঃ মৌচাক ।

(৩২) ইং চংচং চিড়িং ঠেং, চখ গুজগুজ মাথাই নাই ।

- উত্তরঃ কাঁকড়া ।

(৩৩) মাঝ পখরে কাড়ার লাদ ।

- উত্তরঃ কচ্ছপ ।

(৩৪) বার বছরের খাসি,

এক কুট্যাই মাস ।

- উত্তরঃ গেঁড়ি শামুক ।

(৩৫) বাপরে বাপ, মাথায় পড়ল চাপ

ঘর পালালো বাহির বাটে, আমি পালাব কোন বাটে ।

- উত্তরঃ জাল, জল ও মাছ ।

(৩৬) নাখে খায়, চইখে হাগে ।

- উত্তরঃ মাছ ধরার ঘুণি ।

(৩৭) এক টিপনি ঝাঁটাটি ছাতার পারা মাথাটি ।

- উত্তরঃ কুমোরের চাক ।

(৩৮) একাই একাই ফলে, এক সঙ্গে পাকে ।

- উত্তরঃ হাঁড়ি তৈরি করা এবং পোড়ানো ।

(৩৯) সাজালে সাজে বাজালে বাজে,

হেন ফুল ফুটে আছে বাজারের মাঝে।

- উত্তরঃ হাঁড়ি।

(৪০) একটা বুঢ়ীর দাঁতগাই সুদা।

- উত্তরঃ চিরুণি।

(৪১) ইঘর যাই উঘর যাই,

ডুম করি কাচাড় খাই।

- উত্তরঃ ঝাঁটা।

(৪২) এক বুঢ়ীর পিঠে দুধ।

- উত্তরঃ কুলো।

(৪৩) যতই দিবি ততই খায়,

না গড়ালে পেছাই যায়।

- উত্তরঃ দড়ি পাকানো।

(৪৪) টিপিক টিপিক যায়

নেজে আহার খায়।

- উত্তরঃ ছুঁচসুতো।

(৪৫) রাজার ঘরের মেনি গাই,

হাজার টাকার মরিচ খায় ।

- উত্তরঃ শিলনোড়া ।

(৪৬) লহার গাই লহার বাছুর

দুধ দেয় উছুল উছুল ।

- উত্তরঃ তেল পেষানোর যন্ত্র ।

(৪৭) চামচিকা ভুঁইনিকা

তার দাম চদ্দ সিকা ।

- উত্তরঃ কোদাল ।

(৪৮) লিকলিক বাতাটি,

তার সঙ্গে কথাটি ।

- উত্তরঃ বই ।

(৪৯) মামার ছাগল ছুলেই মেমায় ।

- উত্তরঃ মাদল ।

(৫০) থাপড় জমা টুসকি খরচ

বাকি রইল কত ?

- উত্তরঃ আট ।

চা জনজাতিদের দৈনন্দিন জীবনচর্যায় যে সব উপকরণ সাধারণত ব্যবহৃত হয়ে থাকে সেগুলো স্বাভাবিকভাবেই ধাঁধার উপকরণ হিসেবেও ব্যবহৃত হয় থাকে ধাঁধা গুলোতে । সরল মানুষের মনে কৌতূহল এবং মননশীলতায় স্পন্দন তুলতে পারে এরকম বস্তুবৈশিষ্ট্যগুলো রূপক, চিত্রকল্প এবং কবিতার একত্রে সম্মিলন ঘটিয়ে সাধারণত ধাঁধার জন্ম হয়ে থাকে ।

লোকপ্রবাদ প্রবচন

কোনো জাতির আচার, ব্যবহার নৈতিক জীবনবোধ, কৃষি, শিল্প, চেতনা, প্রথা, সংস্কার, ব্যক্তিক ও সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ইতিহাস প্রবাদে ধরা পড়ে । বাংলার প্রবাদগুলোতে যেমন ধরা পড়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন ইতিহাস । তেমনি বরাক উপত্যকার চা বাগানের জনজাতিদের ভাষার মধ্যেও প্রবাদ এবং প্রবচনের উল্লেখ দেখা যায় যার মধ্যে সহজেই ওঠে আসে জনজীবন ও জনসমাজ। যে সব আদিম সম্প্রদায় হাজার বছর ধরে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখে এসেছে, তাদের মধ্যে উঁচুস্তরের মননশীলতা বিকাশ লাভ না করলেও সমাজমানসের উপযোগী মননশীলতা অবশ্যই গড়ে ওঠে । আদিবাসীরাও বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করে এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মতো উন্নত সাহিত্যরসসমৃদ্ধ প্রবাদের রচনা করতে না পারলেও তাদের মননশীলতার উপযোগী প্রবাদ নিশ্চয়ই রচনা করে । প্রবাদের উদ্ভব কাহিনী যথেষ্ট রহস্যাবৃত হলেও সামাজিক প্রয়োজনেই যে এর উদ্ভব ঘটেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই । কোন বিষয়ে বারবার একই অভিজ্ঞতা অর্জন করার পর তার ভিত্তিতে এক একটি প্রবাদ

রচনা অস্বাভাবিক নয় । প্রবাদ মূলত কাহিনী ভিত্তিক । প্রায় প্রতিটি প্রবাদের পেছনেই কোন না কোন কাহিনী বা কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল । বর্তমানে কাহিনীটি লুপ্ত হয়ে গেলেও প্রবাদটি যথারীতি অস্তিত্বরক্ষা করে চলেছে । প্রবাদ কাহিনীর সারবস্তু মাত্র । এখনো অনেক প্রবাদের পেছনে কাহিনীর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় ।

--লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো প্রবাদও গোষ্ঠীজীবনের সম্পদ । কিন্তু গোষ্ঠীগতভাবে অনেকে মিলে ধাঁধা, প্রবাদ আদির সৃষ্টি করেনি, বরং পশ্চাতে ব্যাক্তিমানসের বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা, রসবোধ এবং সৃজনশীলতাই যে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে, তাতে সন্দেহ নেই । সমাজের মধ্যে প্রচলিত আচার ব্যবহার, রীতি নীতি সব কিছুই প্রবাদের মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে থাকে । ব্যঙ্গকৌতুক এবং বক্রোক্তি প্রবাদের প্রাণসম্পদ । "A proverb is a saying in more or less fixed form marked by 'shortness, sense, and salt' , and distinguished by the popular acceptance of the truth tersely expressed in it". [১৭] অর্থাৎ প্রমাণ এমন একটি উক্তি বা বাণী যা কমবেশি একটি অপরিবর্তনশীল আকারের হয়ে থাকে, সংক্ষিপ্ততা, অর্থবহতা এবং সরসতা যার বিশেষত্ব এবং এর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত সত্য গোষ্ঠী বা সমাজ কর্তৃক সাধারণভাবে স্বীকৃত । এখানে আকারের দিক দিয়ে প্রবাদের অপরিবর্তনশীলতা, সংক্ষিপ্ততা, অর্থবহতা এবং সরসতার ওপর যেমন গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, তেমনি গোষ্ঠী স্বীকৃত সত্য যে প্রবাদের আত্মাস্বরূপ তাও স্বীকার করা হয়েছে । কয়েকটি প্রবাদ এখানে উল্লেখ করা যায় ।

(১) মরদের বাত, হাতির দাঁত ।

(২) ধান কুটালে চাল হবেক, পরের নিন্দা করে কি হবেক ।

প্রবাদের প্রথম টাতে দেখা যাচ্ছে যে বাংলা লোকসাহিত্যে যেরকম অনক প্রবাদা আছে যেগুলোতে বন্য জীবজন্তুর কথা ওঠে আসে তেমনি বরাক উপত্যকার চা জনজাতিদের প্রবাদ প্রবচনেও বন্য জীবজন্তুর কথা রয়েছে। এবং বলা হচ্ছে যে নারীর থেকে পুরুষের কথায় সমাজ মান্যতা দেয় বেশি। দ্বিতীয় প্রবাদে ওঠে আসে সামাজিক কিছু ব্যাপার। মানুষের লোভ, হিংসে ইত্যাদি। অন্যের নিন্দা সমালোচনা ইত্যাদি সাধারণ সব ব্যাপার গুলো সহজেই ওঠে এসেছে প্রবাদে। এরকমই সামাজিক সব ব্যাপারেই প্রায় প্রবাদের প্রচলন দেখা যায়। সন্তানের জন্মদাতা হিসেবেই পিতার বিশিষ্ট ভূমিকা প্রবাদেও স্বীকৃত। বিয়ের অনুষ্ঠান, টাকাকড়ি, ধনসম্পত্তি সব ব্যাপারই প্রবাদে শাণিত ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মধ্যে প্রকাশ লাভ করেছে। আমরা এখানে আরও কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে তা দেখে নেব।

(৩) মিয়াঁ বিবি রাজি, কি করবেক কাজই।

(৪) যেমন দাদা ভজহরি, তেমনি দিদি মঞ্জদরী।

(৫) যাহার সংগে মজে মন, কিবা হাড়ি কিবা ডোম।

(৬) যার বেহা তার মনে নাই, সাঁই পড়শীর ঘুম নাই।

(৭) চিড়া বল মুড়ি বল ভাতের পারা নাই,
মাসি বল পিসি বল মায়ের পারা নাই।।

(৮) মাই থাকলে কি কেউ মাসির তরে কাঁদে।

(৯) মায়েই জানে ছেলার বেদন।

(১০) ছানা না কাঁদলে মা অ দুধ খাওয়ায় নাই।

(১১) আয় থাকলে ব্যয়, বাপ থাকলে বেটা।

(১২) বাপে নাই পুতে, চঁগা ধরি মুতো।

(১৩) নিজে বাঁচলে বাপের নাম।

(১৪) যে ছানা কাঁদে না সে ছানা দুধ পায় না।

(১৫) ঘরেউ ভাত নাই, মায়েউ পিটেছে।

(১৬) ছানা হাগে বাঁচতে বুঢ়া হাগে মরতে।

(১৭) রাজার পাদে গন্ধ থাকে না, পরজার পাদে গন্ধ থাকে।

(১৮) আপনার গাঁয়ে কুকুর রাজা।

(১৯) আজ রাজা কাল ফকির।

(২০) গরীবের রাগ পেটে পচে।

(২১) নিজের কথা বললে নিজেকেই পরাচিত করতে হয়।

(২২) আপনার চুল বাড়ুক, পরের চুল পড়ুক।

(২৩) আপনার গুণ জানে নাই খেঁদি, পরকে বলে চেপানাখী।

(২৪) অলপ ধন, বিকল মন।

(২৫) হিসাবের কড়ি বাঘে খায় না।

(২৬) হাতে নাই পয়সা কড়ি, লাউ কাটতে দৌড়াদৌড়ি।

(২৭) মন আছে তো ধন নাই ধন আছে তো মন নাই ।

(২৮) যার যখন চলে, মুতে বাতি জ্বলে ।

(২৯) রাখে হরি মারে কে, মারে হরি রাখে কে ।

(৩০) জিউ মরে আপনার দোষে কি করবেক হরিহর দাসে ।

(৩১) যেমনি গুরুর তেমনি চেলা, মাগে হত্তকী দেয় ভেলা ।

(৩২) যে ঠিনে জল, সেই ঠিনেই গঙ্গা ।

(৩৩) সবার দুয়ারে টঙ্কা টঙ্কা, গুরুর দুয়ারে লবডঙ্কা ।

(৩৪) ঢেঁকি স্বরগে গেলেও ধান কুটে ।

(৩৫) দুধালি গাই এর লাথি অ সহায় ।

(৩৬) ষাঁড়ে ষাঁড়ে লড়াই হয়, বাছুরের ঠেঙ যায় ।

(৩৭) যেমন গরু তেমন বাগাল ।

(৩৮) গরু বুঢ়ালে শিং বাঢ়ে, মানুষ বুঢ়ালে মু বাঢ়ে ।

(৩৯) মানুষ বুঢ়ায় আঁতে, গরু বুঢ়ায় দাঁতে ।

(৪০) মরা হাতি হাজার টাকা ।

(৪১) ছাগলের দ্বারা উ কি ধান মাড়ান যায় ।

(৪২) সাধে কি বিরাল গাছে উঠে ।

(৪২) সাপের লেখা বাঘের দেখা ।

(৪৩) সাপ অ মরে, ডাঁগ অ না ভাঙে ।

(৪৪) সাপে খালেউ খাবেক, বাঘে খালেউ খাবেক ।

(৪৫) অতি সিয়ানের গলায় দড়ি, কুঁচ্যা খায় শালের বাড়ি ।

(৪৬) পঁদে নাই চাম, সেনাপতি নাম ।

(৪৭) হাগব উ নাই, বাট অ ছাড়ব নাই ।

(৪৮) হাগন্তির লাজ নাই দেখন্তির কি লাজ ।

(৪৯) মাছের মধ্যে রুই, শাগের মধ্যে পুঁই, ছাতুর মধ্যে উই ।

(৫০) নাই কাম তো ধান ভান ।

প্রবাদের চলনভূমি সমাজ বা লোকজনের সামগ্রিক রূপ প্রবাদের মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ করা যায় । প্রবাদ যে কোন অঞ্চলের সমাজ জীবনের দর্পণবিশেষ । প্রবাদে লোকভাবনা অকপটে নিবারণ ভাষায় প্রকাশ পেয়ে থাকে । মানুষ জনের রুচি, রসবোধ, নীতিবোধ এবং জ্ঞান প্রবাদে প্রতিফলিত হয়ে থাকে । তাই প্রবাদে কোনরকম সংস্কার বা শব্দ ব্যবহারে বিন্দুমাত্র দ্বিধার ভাব পরিলক্ষিত হয় না । প্রবাদ রচয়িতা অশ্লীল, গ্রাম্য বা ইতর, যে কোন শব্দই হোক না কেন নির্দ্ধিধায় সাবলীল ঢঙে সে শব্দের ব্যবহার করেছে । মানুষের স্বভাব চরিত্র, আচার ব্যবহার প্রবাদে উজ্জ্বল রেখায় অঙ্কিত হয়ে থাকে । প্রবাদে নর অপেক্ষা নারীর সমালোচনাই বিশেষভাবে করা হয়ে থাকে । সমাজ সংসার পারিবারিক জীবন প্রবাদে সর্বাধিক স্থান অধিকার করে আছে ।

লোকসঙ্গীত

লোক সঙ্গীতের উদ্ভব লোকজীবনকে কেন্দ্র করে । লোকসঙ্গীতের ধারাটি মৌখিক। যুগ যুগান্তর ধরে লোকসঙ্গীত সাধারণ নিরক্ষর মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত হয়েছে এবং এইভাবেই তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছে । আদিযুগের সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন ছিল না; তারা গান রচনা করে তা চিরকালের মতো লিপিবদ্ধ করে রাখতে পারত না । সম্ভবতঃ তার ফলেই খাঁটি লোকগীতির আয়তন দুই চারি পঙক্তিতেই সীমাবদ্ধ থাকে । স্মৃতিতে খুব বেশি পঙক্তিকে ধরে রাখাও সম্ভব নয় । তাই ছোটখাটো লোকগীতিও বিভিন্ন গায়কের মুখে বিতর্কিত হয়ে নবতর রূপ ধারণ করে । বিবর্তনের ফলে লোকগীতির উন্নতি এবং অবনতি দুইই ঘটতে পারে । একটি লোকসঙ্গীত হল এরকম,

"মানুষ জনম ঝিঙা ফুলের কলি গ
সাঁঝে ফুটে সকালে যায় ঝরি ।"

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত লোকজীবনকে ঘিরে রয়েছে রয়েছে নানা পর্যায় । লোকসঙ্গীতের একটা বিরাট অংশ গড়ে উঠেছে এই সমস্ত পর্যায়কে সামনে রেখে। লোকগীতির একটা বিরাট অংশ ঋতুবদলের সংবাদ লোকসমাজের কাছে পৌঁছে দেয় । বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান ভরে উঠে লোকগীতিতে । লোকগীতি শ্রমকে করে তোলে গতিময় ও আনন্দজনক । অবসর মুহূর্তে নিয়ে আসে সজীবতার স্বাদ । আনন্দদান লোকগীতির একমাত্র উদ্দেশ্য নয় । লোকগীতি লোকজীবনের দলিল । লোকজীবনের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা বঞ্চনা বেদনার আলেখ্যও । লোকগীতিতে

রয়েছে হৃদয়োত্তাপের নিবিড় স্পর্শ। ক্ষোভ, দুঃখ, অভিমান, লজ্জা, বেদনা, দীর্ঘশ্বাস, আর ধিক্কারে এসমস্ত গীতি পরিপূর্ণ। সজীবতা লোকগীতির অন্যতম প্রধান গুণ। এই গুনটির জন্যই লোকগীতি চিরপুরাতন হয়েও চির নূতন। এ প্রসঙ্গে জনৈক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেছেন,

> "Indeed, a folksong is neither new nor old; it is like a forest tree with roots deeply buried in the past but which continuously puts forth new branches, new leaves, new fruits"[১৮]

লোকগীতি নুতনও নয় পুরাতনও নয়, লোকগীতি কালোত্তীর্ণ। লোকগীতিকে আমরা যখন প্রত্যক্ষ করি তখন তাকে নবীনতর রূপেই দেখে থাকি, তার প্রাচীনতর রূপ আমরা কল্পনা করতে পারি কিন্তু প্রত্যক্ষ করতে পারি না। লোকগীতির প্রাচীনতর রূপ যা লুপ্ত এবং নবীনতর রূপ যা বর্তমান দুটোই সমান সত্য। "A folksong is always grafting the new on to the old"[১৯] মূল লোকগীতির ওপর বিভিন্ন গায়ক নিজ নিজ কবিত্ব-প্রতিভা প্রমাণ করার জন্য কিছু বর্জন কিছু সংযোজন করে নূতন রূপ দিয়ে থাকে। স্মৃতি নির্ভর গায়ক কোন শব্দ বা পদ ভুলে গেলে নতুন শব্দ বা পদ জুড়ে গানটির উন্নতি বা অবনতি ঘটাচ্ছে এবং উভয়ক্ষেত্রেই মূল গানটির রূপান্তর ঘটছে। "A folksong is neither new nor old because it is continually taking on new life; it is an individual flowering on a common stem"[২০] লোকগীতি বহুজনের মুখে মুখে ক্রমাগত বিবর্তিত হয়ে বহুজনের সৃষ্টিতে পরিণত হয়।

- লোকসঙ্গীতের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য হতে পারে এরকম,

(ক) লোকসঙ্গীত পল্লী মানুষ বা প্রাকৃতজনের সহজ সরল মননশীলতার অভিব্যপ্তি । তাই এ জাতীয় গান পল্লীগীতি অভিধায়ও ভূষিত ।

(খ) এ সঙ্গীতের বাণী মুখে মুখে রচিত । গানের মধ্যে কোন কৃত্রিমতা নেই, নেই কোন কষ্ট কল্পনা ।

(গ) গানের বিষয়বস্তু, ভাব, রস আর পল্লীমনে আবেদনশীল সুরই এ জাতীয় গানের সমৃদ্ধি এবং বিস্মৃতি ।

(ঘ) লোকসঙ্গীত অনুশীলনের কোন বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা নেই । স্বভাব দক্ষতাই গায়কের বৈশিষ্ট্য ।

(ঙ) লোকজ মৃৎ শিল্পের মত লোকগীতির অফুরন্ত সম্ভারকে কালসীমাহীন এবং কালসীমাবদ্ধ এ দু'ভাগে ভাগ করা যায় ।

লোকগীতি মূলত পল্লীর মানুষের সৃষ্টি, তাই পল্লীজীবনের সমস্ত উপকরণই লোকগীতির অন্তর্গত হয়ে পড়ে । এই কারণেই লোকগীতি সমস্ত পল্লীজনতার অন্তরের সম্পদ । লোকগীতি মিলিত কণ্ঠের গান, তারই মধ্যে এর পরিপূর্ণতা । লোকসঙ্গীত খুব কম ক্ষেত্রেই একক অনুষ্ঠান । সমষ্টিগতভাবে গোষ্ঠীর প্রত্যেকেই লোকসঙ্গীতে অংশগ্রহণ করে থাকে । ব্যক্তিসত্তার অস্তিত্বকে ছাপিয়ে সমষ্টিসত্তার অস্তিত্বই এখানে প্রধান হয়ে ওঠে। তার ফলে লোকসঙ্গীতের আসরে একটি গোষ্ঠীর কামনা বাসনা সামগ্রিকভাবে প্রতিফলিত হয়ে থাকে । বরাক উপত্যকার চা জনজাতিদের লোকগীতির অধিকাংশই সমষ্টিগতভাবে গীত হয়ে থাকে । করম, টুসু, বিয়ের

গান সমষ্টি সঙ্গীতের প্রকৃষ্ট উদাহরণ । লোকগীতি প্রধানতঃ কোন না কোন উৎসব বা অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই গীত হয়ে থাকে । তাই প্রতিটি আনন্দ উৎসবের সঙ্গে কখনো নৃত্য-গীত, কখনো শুধু গীত অনিবার্যভাবে এসে যায়। ঝাড়খণ্ড সহ অন্যান্য অঞ্চলে, মনসা পূজার জাঁত গান, করম পরবে পাঁতাশালিয়া গান, জাওয়া গান, ভাদু পরবে ভাদুর গান, বাঁধনা পরবে আহিরী গান, টুসু পরবে টুসুর গান, চড়ক পরবে ছো নাচের গান, বিয়ের অনুষ্ঠানে বিয়ের গান, ধরম পুজোয় মাহারা গান রয়েছে, বরাক উপত্যকার চা বাগানগুলোতে জাওয়া, ভাদু, আহিরী, ছো নাচের গান গাওয়া হয় না এখানে সাধারণত করম, টুসু, বিয়ের গান সহ অন্যান্য গান প্রচলিত ।

ঝুমুর নাচ ও কাঠি নাচ

- ঝুমুর বরাক উপত্যকার চা বাগানের সবচেয়ে বেশি প্রচলিত নাচ ও গান+-ঝুমুর গানের সময় নাচ ও করা হয় । ঝুমুর মূলত প্রেমসঙ্গীত । বৈষ্ণব প্রভাবের ফলে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলাও ঝুমুরের অঙ্গীভূত হয়, বলা যেতে পারে লৌকিক প্রেমের চেয়ে রাধাকৃষ্ণের প্রেমই শেষ পর্যন্ত ঝুমুরের শ্রেষ্ঠ অংশ অধিকার করে ফেলে। তাছাড়া পৌরাণিক ঘটনা এবং সামাজিক বিষয়ও এর উপজীব্য হয়ে পড়ে। এখানে কয়েকটি ঝুমুরের উল্লেখ করা যায়,

(১) তুমি লাগো পরের পুত
তরো লাগি এত দুঃখ
তরো লাগি কান্দিছে মোর হিয়া
তুমি নাকি নিদারুণ প্রিয়া ।

(২) সাঁঝ সকালের বেলা
কে মারিল চালে ঢিলা
ঢেলা নাই গো দিদি
মিঠাইয়ের পুটলা ।

ঝুমুরের পালা গানও হয়ে থাকে,

(৩) রাম বল হায়, ওগো গোবিন্দ বল হায়,
পতিত পাবনা বানাও
উড়ে কত দূরে
পতিত পাবন বানা জেগে অক্রূর ।

(৪) কহি গলারে মোর মুরলি পুকা
ও ভঙ্গিরে মোর সুরটি বুঝায়,
কহে বনমালী সেপারে সরণ
ঝুনু ঝুনু তন বিন রাধিকা ।

এছাড়াও চা পাতা তুলতে গিয়ে তারা নানা ধরণের গান করে থাকে ।

(৫) সাহেব বলে কাম কাম
বাবু বলে ধরে আন
সর্দার বলে লব পিঠের চাম
ও দাদা ধনীরাম
কুদাল মারা বড় কঠিন কাম ।

(৬) পাতি তুলগো মিনি

তিন পাতার নীচে

গলি পাহি ধর আগে আগে ।

(৭) কালো কালো ছড়িগিনা

পাতি তুলতে যায় ।

মাথায় আছে ছিট গামছা

ওজনেতে যাও

তোরা দেখ গো সবাই

সোনার মাদলি গলায় ঝুলছে ।

(৮) তুমি যাবে পর দেশে হামি যাব সঙ্গে

রাঁধিব বেগুনভাত পারশির রঙ্গে ।

ছবি ৭, কাছাড়ের বড়শিঙ্গা চা বাগানে 'কোরাস' আয়োজিত বারক উপত্যকা ভিত্তিক ঝুমুর ও কাঠি নাচ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের একটি দৃশ্য ।

ছবি ৮, একটি অনুষ্ঠানে, কাছাড় জেলার ডলু চা বাগানের ঝুমুর নাচের একটি দল, স্থান বঙ্গভবন, শিলচর ।

ছবি ৯, কাছাড়ের কালাইন চা বাগানে দোল উৎসবের সময় নৃত্যরত কাঠি নাচের একটি দল ।

টুসু পুজো

- বরাক উপত্যকার চা জনজাতিদের মধ্যে টুসু গানের প্রচলন সবচেয়ে বেশি। টুসু হচ্ছে দেবী 'শীতলা' র মত । টুসুর কোন মূর্তি থাকে না । কাগজ, বাঁশ, ইত্যাদি দিয়ে তৈরি হয়ে থাকে । এটা একধরণের ব্রত । যে কোন লোক এখানে যোগ দিতে পারে । সন্ধ্যাবেলা দল বেঁধে টুসু গান করে আরেক বাড়ি থেকে গিয়ে টুসুকে আনা হয় । তারপর চুল, হলুদ দিয়ে টুসুর চরণ ধুয়ে টুসুকে সাজানো মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করা হয় । চলতে থাকে সারাসাত গান । রাত বারোটা পর্যন্ত সব ঠাকুর বিষয়ক গান হয় । তারপর রাত শেষের দিকে পাশের বাড়ির টুসু পূজার দল আসে মালা বদল করতে, এই বাড়ি থেকে ওই বাড়ি জাওয়া হয় সই (বন্ধু) পাতাতে । তখন শুরু হয় গানের লড়াই । বিভিন্ন ফল, বাতাসা ইত্যাদি দেওয়া হয় প্রসাদ হিসেবে । পরদিন বিকেলের দিকে সবাই নাচ গান করে টুসু কে 'ভাসান' (বিসর্জন) দেয় নদীতে । সেখানেও হয় গানের লড়াই । কয়েকটি টুসু গানের উল্লেখ করা যায়,

(১) রাঙ্গা চরণ পোঁছাব মাথার কেশে
টুসু আয় মা দেশে ।

(২) এসোগো এসোগো টুসু হৃদয় মন্দিরে
আসিলে আনন্দ হবে নিরানন্দ যাবে দূরে ।

(৩) সঞ্জা দিতে যাছ টুসু
ফুল তুল ফুল তুল টুসু
বাছে তুল ভাবড়ি
বিনে সূতে হাড় গাঁথেছি

লোকে বলে হাঁসুলি ।

(৪) ঘুমানো ঘুমানো টুসু
অনেক রাত্রি রাত্রি হল গো
- তোমার ও যে দাসী কুসি
ঢুলিয়ে পড়িল গো ।

(৫) তোরা যে পাল্লা আড়লি
তোর পাল্লার কি ধার ধারি
এমন সারব পাল্লার বারি
পাঠায় দিব চা বাড়ি ।

ছবি ১০, কাছাড়ের লাবক চা বাগানে টুসু বিসর্জনের সময় ভারাক্রান্ত মনে টুসু বিদায়ের গান করছেন এক মহিলা চা শ্রমিক ।

করম পুজো

পৃথিবীতে মানবসৃষ্টির উন্মেষলগ্ন থেকে প্রকৃতিই মানুষের আশ্রয় । বাগানের চা শ্রমিকের উৎসব-অনুষ্ঠানের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পূজা হল 'করম পরব' (করম পূজা) । করম পূজা আসলে বৃক্ষ পূজা । এটা বাগানের রিকিয়াশন বা ভূঁইয়া জাতির মধ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত । ব্রতকথা এই পূজার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ । করম একরকমের গাছ, যার পাতা বড় বড় ও গোলাকৃতি । কুমারী মেয়েরা সারাদিন উপবাস থেকে সন্ধেবেলা উঠোনে পুঁতে করমের । সাধারণত সেদিন মঙ্গল বার হয়। ছয়দিন ব্যাপী পুজো হয় । পুজোর সামগ্রী হিসেবে লাগে, নতুন টুকরি, কলা, বাতাসা, মটর ইত্যাদি । সামনের কোন নদীতে গিয়ে টুকরিতে বালি তুলে আনা হয় । গাছের তলায় গিয়ে 'করম বাবা' কে নেমন্তন্ন করা হয় এবং সেই সঙ্গে করমের একটি ডাল এনে বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত করা হয় । প্রতিষ্ঠিত বা স্থাপন করার সময় 'কিচ্ছার' (গল্প) আকারে গল্প বলা হয় । ভাদ্র মাসের একাদশীতে পুজো শুরু হয় । এবং পুজোকে কেন্দ্র করে চলতে থাকে অফুরন্ত নাচও গান। নাচ ও গানের বিষয়বস্তু জীবন, জীবিকা, সুখ দুঃখ ইত্যাদি । পুজোর উপকরণ হিসেবে বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে লাগে নাকাড়া, মাদল, বাঁশি, করতাল, ঘুঙুর ইত্যাদি । করম পুজোয় পঞ্চশস্যের প্রয়োজন হয় । এর মধ্যে থাকে ধান, ঠাকুরী কলাই, গম, যব ও ভুট্টা । পাঁচটি শস্য পাঁচটি রঙের প্রতীক । কলাই কালো, যব সাদা, ধান হলুদ, গম লাল, ভুট্টা সবুজ । সবশেষে অঞ্জলি দিয়ে পুজো শেষ হয় । নদীতে গিয়ে 'ভাসান'(বিসর্জন) এর সময় দু' দল মিলে গানের লড়াই হয় । করম পুজোর গান কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা যায়,

(১) তেলি ঘরে তেল নাই
ধোবী ঘরকে বাতি ।
জ্বলরে বাতি আজ সারা রাতি ।

(২) কুদাল বেট বেট
দেওয়ানের ছড়ি ছড়া
ভাল মেট মেট ।

(৩) চল চল করম রাজা
ঘরের দুয়ারে
ডালি সাজাবো গো করম রাজা ।

(৪) যাও যাও করম রাজা
যাহ শ্বশুরাল আনিবারে ফিরায় ।

মোটকথা হল বারক উপত্যকার চা জনজাতিদের দৈনন্দিন জীবনে সব কিছুর মধ্যেই গান বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে ।

বরাক উপত্যকার চা জনজাতিদের বিবাহরীতি

পৃথিবীর সভ্য অসভ্য প্রত্যেকটি জাতিরই জীবনযাপনের নির্দ্দিষ্ট একটা ধরণ আছে, ইংরাজিতে যাকে বলে 'স্টাইল' । কোন একটি নির্দ্দিষ্ট যুগে, একটি নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারী মানুষের সমাজ কাঠামো নির্ভর করে মূলত তার অর্থনৈতিক বনিয়াদের ওপর । মানুষের সংস্কৃতি শুধু রাজনীতি নির্ভর নয় প্রকৃতি নির্ভর ও বটে । লোকসংস্কৃতি মূলত কৃষিকেন্দ্রিক

গ্রামসমাজের প্রাকৃতজনের সামগ্রিক জীবনাচরণ, জনবিন্যাস ও জীবনোপলবদ্ধির পরিশীলিত অভিব্যাপ্তি, যা এক বিশিষ্ট নরজাতির সুপ্ত কৌমচেতনা ও আঞ্চলিকতায় বিধৃত ।

--আদিম মানুষের কৃষি যুগে উত্তরণের পর, তার মানসিকতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মৌলবিচার্য বিষয় তার জন্ম মৃত্যু বিবাহ, তার ধর্ম কর্ম পারিবারিক জীবন । চা জনজাতিদের মধ্যে বিভিন্ন পদবী ধারি লোক রয়েছে । সবার সমাজ আলাদা, নিয়ম আলাদা । চা জনজাতিদের সমাজে বিয়েতে বা অন্য অনুষ্ঠানে মন্ত্র নেই, একথা ঠিক নয় । মন্ত্র আছে তবে বৈদিক বা সংস্কৃত মন্ত্র নেই এবং মন্ত্রের বহুল ব্যবহারও নেই । অলৌকিক শক্তির প্রতি প্রার্থনাই মন্ত্র। গানের ব্যাপারটাই আসলে চা জনজাতি সমাজে এক বিশাল জায়গা জুড়ে রয়েছে । বিয়ের অনুষ্ঠানে হলুদ নিয়ে আসে বর/কনের বাড়ির লোক,

(১) হাত যে মেলি মেলি
পাও যে মেলি
মেলিতে মেলিতে গো
লগন আইলো ।

(২) মাখ ধনী রাইপুরের হলুদ
ছেছিলে না ছেছায় করা
বাটিলে না বাটায়
কন্যার বাবা গেছলো
রাইপুরের বাজারে গো ।

মেয়ে সাজাতে গিয়ে গাওয়া হয়, -

(৩) কি লেখছ লেখ রানী
বাতির আলোতে
বেঁধা ছড়ার লেখন খাড়ি
রাখ যতনে ।

জল ভরতে যাবার সময় গাওয়া হয়, -

(৪) হাত লাড়ে জল আনব কলসে
ওগো কলস ভাঁগো গেলে
ছোট ভাই/বনের বিয়েতে
হাত লাড়ে আনব কলস ।

বিয়ের পর স্বামী তার স্ত্রীকে খোলা আকাশের নীচে নিয়ে গিয়ে ধ্রুব নক্ষত্র দেখায়। ইত্যাদি ।

বরাকের চা জনজাতি সমাজে পারলৌকিক ক্রিয়া

বরাকের চা জনজাতি সমাজে মানুষ মারা যাওয়ার পর তার অন্তিম কাজ সম্পন্ন হয় যাকে তারা 'মাটি দেওয়া' বলে । এখানেও ভিন্ন পদবী ধারি সম্প্রদায়ের ভিন্ন নিয়ম রয়েছে । তবে কয়েকটা জিনিষ ছাড়া খুব একটা অমিল কোথাও চোখে পড়ে না । আগেও বলা হয়েছে যে সব ক্ষেত্রেই গান

জড়িয়ে রয়েছে চা জনজাতি সমাজে । কীর্তন করে সবাই মিলে নিয়ে যায় শ্মশানে, কেউ সমাধি দেয়, কেউ অগ্নিসৎকার করে ।

(১) যখন আমার প্রাণ যাবে
ওই দেহ পড়ে রবে
সঙ্গে কেউ তো যাবে না রে ।

মারা যাওয়ার দশ দিনের দিন বাড়ির সবাই নদীতে যায় 'ঘাট' (শুদ্ধ) করতে। বাড়ির ছোট থেকে বড় পুরুষেরা মাথার চুল ফেলে শুদ্ধ হয় ।

(২) ভব নদীর ভিষম ঢেই
পার করিবারে নাই কেউ
পার কররে দীনবন্ধু
পার কররে আমারে
পার কররে দীনবন্ধু;
ওপার কর হে
ভবের কাণ্ডারি দিয়ে
পার কর হে ।

তারপর সমাজ ডেকে একদিন দৈ, চিঁড়ে খাওয়ানো হয় ।

বরাকের চা জনজাতি সমাজে সন্তান জন্মের পর সামাজিক অনুষ্ঠান

বরাকের চা জনজাতিদের সমাজে সন্তান জন্মের পর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সামাজিক রীতি রেওয়াজ গুলো পালন করা হয় । এখানেও সম্প্রদায় বিশেষে নিয়ম আলাদা হয় । তবে সাধারণত সন্তান জন্মের নয় দিনের দিন নাপিত ডেকে বাড়িতে সবাই চুল নোখ কেটে শুদ্ধ হয়। যা তাদের সমাজে 'নাপিত ধোবী করা' বলেই প্রচলিত । একুশ দিনের দিন বাড়িতে হোম--যজ্ঞ হয় । সমাজে সবাইকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হয়। চা জনজাতি সমাজ এটাকে 'একুশা' বলে । এখানেও বসে গানের আসর,

(১) নন্দ যশোদার ঘরে
কৃষ্ণ জনম নিল
বেঠিক বেঠিক শ্বশুর ।
আর জাতিকুল
বেঠিক বেঠিক আইল ফাগুন মাস
ঘরের বেটি বরমাস
বেঠিক বেঠিক শ্বশুর ।

যে কোন অনুষ্ঠানেই আসলে তারা গান করে থাকে । সামাজিক সব অনুষ্ঠানেই তারা গান করে সেটা জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে যাই হোক না কেন । গানের লড়াইও অনেক বড় জায়গা জুড়ে রয়েছে চা জনজাতি সমাজে ।

ক - কালো কালো বল না
কালো জলে যাইও না

কালো জলে আছে কত ছলনা

দেখরে মন ভুলে যেয়ো না ।

খ – আমরা গোয়ালা জাতি

নানা রঙের পান করেছি

হাতে দিতে দিলাম মুখে পান

বন্ধুর নাই যে টান

কি দিয়ে বানাব সুরা পান ।

ক – কেহ পড়ে লাল শাড়ি

কেহ পড়ে নীল শাড়ি

কেহ পড়ে সোনারূপার গহনা

দেখরে মন ভুলে যেও না ।

খ – রং দিয়ে মলেছি গাঞ্জা

খাও রে পরানের বন্ধু

তোমার গাঞ্জা যেমন তেমন

আমার গাঞ্জা মধুর ।

পৃথিবীতে এমন জাতি আর ক'টা আছে যারা গান গেয়ে গেয়ে নিজের দুঃখ কষ্টের কথা বলে !

বরাকের চা জনজাতিতে ফোকমেডিসিন বা জড়িবুটি গাছগাছড়ার চিকিৎসা

মন্ত্রতন্ত্র, ঝাড়ফুঁকের পাশাপাশি জড়িবুটি ও দেশীয় গাছগাছড়ার ছালমূল পাতা দিয়ে প্রাচীন ভেষজ চিকিৎসা প্রণালী বরাকের চা জনজাতিদের মধ্যে প্রচলিত। বিশ্বায়নের কবলে এসে পুরোপুরি লুপ্ত হয়ে যায় নি এখনও।

উচ্চরক্তচাপ ও বহুমূত্রের চিকিৎসাঃ- সজনে পাতার রস, সজনে পাতার বড়া, সজনে ফুল সেদ্ধ করে খাওয়া । তারপর আঠিয়া বা বিচিকলার ভাড়ালির রস পান করা।

চর্মরোগের চিকিৎসাঃ- নিমপাতা, তুলসী পাতর রসের প্রলেপ দেওয়া।

মাথা ব্যথার চিকিৎসাঃ- বড় বাকড় গাছের পাতার রস নাক দিয়ে টানা ও ঘৃতকুমারীর পাতা দিয়ে জলপট্টি দেওয়া। ইত্যাদি।

বরাক উপত্যকার চা জনজাতিদের মধ্যে নিচে উল্লেখিত পদবী গুলো লক্ষ্য করা যায়, -

(১) ফুলমালি, (২) রী, (৩) দুষাদ, (৪) চাষা, (৫) রিকিয়াশন, (৬) পানীকা, (৭) পট্টনায়ক, (৮) রাজভর, (৯) লোহার, (১০) তাঁতি, (১১) বাক্তি, (১২) কূর্মি, (১৩) ভূমিজ, (১৪) কৈরি, (১৫) হাজাম, (১৬) সিং, (১৭) করি, (১৮) গোয়ালা, (১৯) যাদব, (২০) মির্ধা, (২১) কল, (২২) বীন, (২৩) মুঁড়া, (২৪) পাল, (২৫), বাইগা, (২৬) ধোবী, (২৭) গড়, (২৮) তন্তুবাঁই, (২৯) ঘাটোয়ার, (৩০) আহির, (৩১) বাউরি, (৩২) কুরকু, (৩৩) ভূঁইয়া, (৩৪) রবিদাস, (৩৫) কুমার, (৩৬) মাঝি, (৩৭) কর্মকার, (৩৮)

আকুঁড়া, (৩৯) ডোম, (৪০) কালিন্দি, (৪১) সাহা, (৪২) সুরি, (৪৩) মালী, (৪৪) কন্দ, (৪৫) কাহার, (৪৬) কুণ্ড, (৪৭) এক্কা, (৪৮) বারিটা, (৪৯) সাঁওতাল, (৫০) লোধী, (৫১) মালাকার, (৫২) মাল, (৫৩) দলই, (৫৪) কালোয়ার, (৫৫) রাউত, (৫৬) ওড়াঙ্গ, (৫৭) কেওট, (৫৮) ভর, (৫৯) মুণ্ডা, (৬০) গড়াইত, (৬১) কানু ইত্যাদি ।

এবারে প্রশ্ন জাগতেই পারে এমন সুন্দর নাচগান, সামাজিক রীতি রেওয়াজ রয়েছে যাদের তারা কি খুব ভালো ভাবে জীবন কাটাচ্ছে ? ধরে রাখতে পারছে কি তাদের অমন সুন্দর সংস্কৃতিকে ? নাকি সেখানেও গ্রাস বিশ্বায়নের ? প্রযুক্তির বিস্ফোরণ, বাণিজ্যের বিশ্বায়ন প্রভৃতি সার্বিকভাবে আর সবার মতোই বরাকের চা জনজাতিদের মধ্যেও ভোগবাদী মানসিকতার জন্ম দিয়েছে , আর এর প্রভাব শিল্প সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও পড়েছে । শিল্পের চেয়ে বিনোদনের কদর হয়েছে বেশি। ফলে ঝুমুরের যে নান্দনিক ঐতিহ্য সেটা থেকে প্রায় দূরে সরে যেতে বসেছে চা জনজাতি সমাজে ।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে যারা বাস করেন তাদের আমরা, নাগরিক সমাজ, চা জনজাতি, আদিবাসি, লেবার ইত্যাদি বলে ডাকি এবং হয়তো এর ফলেই তারা তাদের আসল পরিচয় সবার কাছে তুলে ধরতে পারেন না যে তারাও মানুষ এবং সুন্দর করে মানুষ সমাজে বেঁচে থাকার অধিকার তাদেরও আছে । মাথা নুয়ে নিজেকে আদিবাসি বলেই পরিচয় দিতে বাধ্য হন । সারাদিন অমানুষিক পরিশ্রম করে দৈনিক সামান্য টাকা 'হাজিরা' ও সামান্য কিছু চাল আটা চাপাতা রেশন দিয়েই চলে তাদের জীবন যাপন । যাদের জন্য শিক্ষার ভাল ব্যবস্থা নেই, নেই স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা, অনেকেই বিনা

চিকিৎসায় মারা যান, হয়তো মরতে হয় বলে ।এরকম উদাহরণও চা বাগানে কম নয়, অনন্ত বরাক উপত্যকার চা বাগান গুলোতে চোখ বুলালে তো তাই মনে হয় । সরকারি সব রকমের সুযোগ সুবিধে থেকেও যারা সহস্র যোজন দূরে । যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রকৃতি সুন্দর হয়ে থাকে, আমরা যারা বছরে বা মাসে, ছুটির দিনে প্রিয়জনদের নিয়ে সেই সবুজে ঘুরে আনন্দ নিই তারা একবারও ভেবে দেখি না যে সেইসব প্রকৃতি রক্ষকদের বাস্তব জীবনচিত্র আসলে আলাদা যা আমাদের সবার কাছে একেবারে অস্পষ্ট । আমরা কাছাড়ের ডলু চা বাগান, নগর চা বাগান ঘুরে পরিবার পরিজনদের নিয়ে পিকনিক করি কিন্তু কখনো চোখে পড়ে না সেই সব চা জনজাতি শিশুদের যারা আজও একুশ শতকে দাঁড়িয়ে রাস্তায় ন্যাংটা ঘুরে ।

বেশ কিছুদিন আগে কাছাড় জেলার নারাইনছড়াতে বরাক উপত্যকার সামাজিক সংস্থা 'কোরাস' আয়োজিত এক ঝুমুর কাঠি নাচের অনুষ্ঠানে, লম্বাটিলা, মৈষাখাল, নুনছুরি, বৈলতাটিলা, চাপাকোনো দিননাথটিলা, বাঁশটিলা, পাত্রীটিলার চা বাগানের জনগোষ্ঠীরা অংশগ্রহণ করে । বরাক উপত্যকার অন্যান্য জনজাতিদের মতোই এরাও প্রতিদিন পরিবর্তিত হচ্ছে । এদেরও পেটের দায়ে পাড়ি দিতে হচ্ছে ব্যাঙ্গালোর, শিলং, চেন্নাই । কারণ চা বাগানে কাজ নেই তাছাড়া সীমিত টাকা দিয়ে পরিবার চালানো কষ্টকর । সেখানেও হয়তো তারা হচ্ছে নির্যাতনের শিকার । ফলে খুব সহজেই তারা দূরে সরে যাচ্ছে ঝুমুর কাঠির হৃদয় থেকে। সেই চা বাগানের শ্রমিকদের যখন 'কোরাস' দলের সদস্যরা জিজ্ঞেস করেন, এখন আর কেন তারা নাচ গান করেন না বেশি, তখন সেইসব শ্রমিকরা প্রতিউত্তরে জানান যে এখন পেটের খাবার যোগাড় করতে করতেই তাদের দিন কেটে যায়, পরব কবে

আসবে আর কবে তারা নাচবে ঠিক মনে থাকে না । ওই বাগানেরই চা শ্রমিক মিলন কল, সুধীর মুণ্ডা, বিজন মুণ্ডারা আরও বলেছেন যে চা বাগানের ছেলেরা এখন সবাই বাইরে চলে যাচ্ছে, মেয়েরা বস্তি বাড়িতে 'বিল্ডিং ঢালাই' এর কাজে চলে যাচ্ছে ফলে নাচ গানের আসর আর খুব একটা বাগানে হয়ে ওঠে না । চা বাগানে যারা থাকে তারা হয়তো কোনও উৎসবে যেমন 'দোল' উৎসবের সময় বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাঠি নাচ করে, কিন্তু তাদের খেদ হল সেইসব গান আর এখন শহরের বাবুদের বাড়িতে জমে ওঠে না, গান শুনে লোকে টাকা বেশি দেয় না, কেউ কেউ তাদের দেখে দরজা বন্ধ করে দেয় । তাই তারা এখন বুদ্ধি করে আধুনিক কিছু ছায়াছবির সুর, কিছু নতুন বাজনা নিজের মতো যোগ করে দিয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করার চেষ্টা করে । তাহলে তো বলতে পারা যায় বিশ্বায়ন তাদেরকেও এখন শিখিয়ে দিচ্ছে কী করে বাজারিকরণ করতে হয় । তাহলে কি আমরা বলব যে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সমাজই ভাল ছিল ! কোথাও কোথাও ক্ষেত্র সমীক্ষণ করতে গিয়ে শ্রমিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে কেউ কেউ এরকমও বলেছেন যে ব্রিটিশরা পেটে লাথি মারত না ।

শোষণ, বঞ্চনা, প্রতারণা, দারিদ্রতা এখনো বরাক উপত্যকার চা জনগোষ্ঠীর পিছু ছাড়েনি । শিক্ষা, চিকিৎসা আর পুষ্টির অভাবে সীমাহীন কষ্টের সাথে দিন কাটাচ্ছেন যারা তাদের ও রয়েছে একটা নিজস্ব ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি । এতো প্রতিকূলতার মাঝেও তারা হারিয়ে যেতে দেবেন না তাদের সংস্কৃতি ।

তথ্যসূত্র

১। লোকসংস্কৃতি প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, নির্মল বেরা, পুস্তক বিপণী, বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, দোলযাত্রা, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ।

২। লোকসংস্কৃতি প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, নির্মল বেরা,পুস্তক বিপণী, বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, দোলযাত্রা, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ।

৩। লোকসংস্কৃতি প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, নির্মল বেরা, পুস্তক বিপণী, বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, দোলযাত্রা, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ।

৪। লোকসংস্কৃতি প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, নির্মল বেরা, পুস্তক বিপণী, বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, দোলযাত্রা, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ।

৫। ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য,বঙ্কিম চন্দ্র মাহাত, অবনীন্দ্রনাথ বেরা বাণীশিল্প ১৪ এ টেমার লেন, কলকাতা।

৬। ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য, বঙ্কিম চন্দ্র মাহাত, অবনীন্দ্রনাথ বেরা বাণীশিল্প ১৪ এ টেমার লেন, কলকাতা।

৭। লোকসংস্কৃতির গবেষণা পত্র শ্রাবণ, আশ্বিন সংখ্যা।

৮। লোকসংস্কৃতির গবেষণা পত্র শ্রাবণ, আশ্বিন সংখ্যা।

৯। লোকসংস্কৃতির গবেষণা পত্র শ্রাবণ, আশ্বিন সংখ্যা।

১০। লোকসংস্কৃতির গবেষণা পত্র শ্রাবণ, আশ্বিন সংখ্যা।

১১। বরাক উপত্যকার চা শ্রমিকের সাংস্কৃতিক পরিসর এবং প্রাসঙ্গিক কথা, রমাপ্রসাদ বিশ্বাস, সৃজন গ্রাফিক্স এ্যান্ড পাবলিশিং হাউস, শিলচর, পৃষ্ঠা, ৭৮।

১২। হামদের বাত, কাজল দেমতা(সম্পাঃ) জানুয়ারি সংখ্যা ২০১৪ ইংরেজি।

১৩। B.R.P., Letter no 161, 10th November 1862 .

১৪। বরাক উপত্যকার চা বাগানের লোকসংস্কৃতির অতি আভাস, বাবুল নারায়ণ কানু, অসম সাহিত্য সভা জার্নাল, শিলচর ১৯৮৬ ৮৭, পৃষ্ঠা, ৭৮ ।

১৫। উত্তরবঙ্গ আদিবাসি চা শ্রমিকের সমাজ ও সংস্কৃতি, সমীরণ চক্রবর্তী কলকাতা।

১৬। বাংলার লোকসাহিত্য, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ৫ম খণ্ড ।

১৭। Oriental Proverbs: Ed. Dr. Mahadev Prasad Saha .

১৮। , 'Folksong', RV Williums, Encyclopaedia Britanica, 14th edn. 1932 .

১৯। , 'Folksong', RV Williums, Encyclopaedia Britanica, 14th edn. 1932 .

২০। , 'Folksong', RV Williums, Encyclopaedia Britanica, 14th edn. 1932 .